অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মহাকাল প্রলয়

বাপুজী দশরথভাই প্যাটেল

বিশ্ব পরিবর্তক ঈশ্বরীয় বিদ্যালয়
আমেদাবাদ

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মহাকাল প্রলয়

বাপুজী দশরথভাই প্যাটেল

প্রথম সংস্করণ ঃ ২০০৮

প্রতিলিপি ঃ ৩০০০

বঙ্গানুবাদ ও বাংলা সংস্করণ ঃ মৌনাপ্রিয়া নিপা (পশ্চিমবঙ্গ / কলকাতা - ১০৪)

সাল ঃ জানুয়ারী ২০২০

বিশ্ব পরিবর্তক ঈশ্বরীয় বিদ্যালয়
C/o রাধে পার্টি প্লট, নিউ রানীপ রোড
চেনপুর গাও, আমেদাবাদ ৩৮২৪৭০

Website : www.paramshanti.org

E-mail : anant98251@yahoo.com

Youtube Channel : Bapuji Dashrathbhai Patel

Link : www.youtube.com/anant98251

নিবেদন

এই অলৌকিক জ্ঞান ভারতের শাস্ত্রগুলির থেকে সারাংশ রূপে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আদিকালে ভারতভূমি চৈতন্যরূপী আত্মাদের পবিত্র ভূমি ছিল। এই দিব্য জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বোঝানোর জন্য সাথে অলৌকিক চিত্রও দেওয়া হয়েছে। দিব্য জ্ঞান অসীমের পরম পিতা পরম-আত্মার স্বমুখ থেকে উচ্চারিত হওয়া বাণী প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরম পিতা দিব্য বিমানের সাহায্যে বীজরুপী আত্মাদের দিব্যস্বরূপ প্রদান করে, স্থূল সৃষ্টির আত্মাদের সূক্ষ্ম শরীরে রূপান্তরিত করতে এসেছেন। এই জ্ঞান অনুভব ও ধরণ করে বিশ্ব কল্যাণ কার্যে সহযোগিতা করতে পারেন। আর আপনি সাকারী থেকে আকারী হয়ে দেবতার পদ প্রাপ্ত করার প্রচেষ্টা করতে পারেন। লেখন কার্যে কোন প্রকার ত্রুটি থাকলে মার্জনা করবেন।

আমাদের website : www.paramshanti.org থেকেও আপনি জ্ঞান লাভ করতে পারেন।

আমেদাবাদ — ম্যানেজিং ট্রাস্টি

তা ১.১০.২০০৮ — বিশ্ব পরিবর্তক ঈশ্বরীয় বিদ্যালয়

দিব্য জ্ঞান সন্দেশ

মহাকালেশ্বর অকাল মূর্তি সর্বশক্তিমান কালের চক্র থেকে মুক্তকারী অমরলোকের বাহক জ্ঞানের সাগর অমরনাথ, পরশনাথ, দিব্য দৃষ্টির দ্বারা মুক্তি আর জীবন মুক্তির দাতা, ব্যক্ত থেকে অব্যক্তে রূপান্তরকারী জ্ঞানস্বরুপে স্থিতকারী, নতুন ভূবনের সৃষ্টিকারী, পরম তত্ত্ব আর পরম জ্যোতি, দীপ্ত আলোয় স্থিতকারী, অসীমের পরমপিতা তাঁর অসীমের সন্তানদের আহ্বান করছেন। ত্রিকালদর্শী সকল আত্মার জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাতক, নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন জ্ঞানপ্রদানকারী, জ্ঞানের তপন, ত্রিলোকের নাথ, ত্রিকালের আদি মধ্য ও অন্তের মহাজ্ঞাতক, এই সাকার সৃষ্টির মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন। আর এই জ্ঞানরূপী ভানু উদয় হওয়াতে সর্বজ্ঞানের রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে, সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পর্দা সম্পূর্ণ রূপে উঠে যাবে। সময়এরও সমাপ্তি হয়ে যাবে। চতুর্বেদ আর সকল শাস্ত্রের সাররহস্যজ্ঞানী অসীমের পরম পিতা নিরাকারী থেকে আকারী আর আকারী থেকে সাকারী হয়ে এই সাকার সৃষ্টিতে মহাকালেশ্বর জ্ঞান সূর্যরূপে প্রকাশ হয়ে গেছেন, আর আমেদাবাদ পাণ্ডবভবন তৈরি হবার পরে বিশ্ববিজেতা ১০৮ বীজরূপী আত্মা এই পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য সকল কেন্দ্র থেকে এখানেই আসবেন, কারণ গুজরাটের রাজধানী আমেদাবাদকে সারা বিশ্বের লাইট হাউস বানাতে হবে। গুজরাটকে এমন লাইট হাউস বানাও, যে তা শুধু ভারতের লাইট হাউস না হয়ে যেন সারা বিশ্বের লাইট হাউস হয়।

ম্যানেজিং ট্রাস্টি

তা. ১.১০.২০০৮ — বিশ্ব পরিবর্তক ঈশ্বরীয় বিদ্যালয়

চেনপুর, আমেদাবাদ ৩৮২৪৭০

বিষয়সূচী

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	নিষ্কাম কর্ম	3
২.	১৪টি লোকের বর্ণনা	3
৩.	আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি কি করে হল?	8
৪.	কালচক্র বা কালের গতি	15
৫.	প্রলয়—মহাপ্রলয়	20
৬.	অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মহাকাল প্রলয়	30
৭.	আত্মার তিন প্রকার গতি ঃ পিতৃযান মার্গ, দেবযান মার্গ আর নিকৃষ্ট গতি	35
৮.	অব্যক্ত বাণী (ব্রহ্মাকুমার ও কুমারীদের জন্য)	37

১. নিষ্কাম কর্ম

যতক্ষণ আমরা সকাম থাকি, ততক্ষণ আমরা কামনা-যুক্ত কর্ম করতে থাকি। নিষ্কাম স্বরূপের কোন জ্ঞানই আমাদের নেই; সেটাই কর্মের রূপ ধারণ করে আর ফলের ইচ্ছা দ্বারা কর্মরূপী কালচক্রে আহুতি দিয়ে (স্থিত করে) পুনর্জন্মের আবর্তে ঠেলে দেয়। বাস্তবে নিষ্কাম বস্তু হ'ল আত্মা বা পরম আত্মা। সেই নিষ্কাম তত্ত্বকে না জেনে আমরা নিষ্কাম হতে পারি না। যখন আমরা নিষ্কাম তত্ত্বকে জেনে নেই, তখনই আমরা ওই নিষ্কাম তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিষ্কাম কর্ম করার মাধ্যমে নিষ্কামতা লাভ করতে পারি। এর থেকে স্পষ্ট হয় যে আমরা তত্ত্বনিষ্ঠ হয়েই যথার্থ সংসার ত্যাগী হতে পারি। সমত্বযোগ তখনই সম্ভব হয় যখন আমরা কোন সমত্বতে নিষ্ঠ থাকি। কর্ম না করলে নিষ্কামতা সিদ্ধ হয় না। যে কর্মে কামনা থাকে না সেটাই নিষ্কাম কর্ম। জ্ঞানযোগীগণ নিরহংকার হয়ে নিষ্কাম কর্ম করেন। নিরন্তর কর্ম চলাকালীন যেন আমাদের মনে কোন ফলের আশা না থাকে, এটাই 'অকর্ম ভাব'। নিষ্কাম তত্ত্বকে না জেনে আর তাতে একনিষ্ঠ না হয়ে যে নিষ্কাম কর্মের বড়াই করে, আসলে সে নিজেকে ধোকা দেয়। 'কর্মভাব' কালের অন্তর্গত ; কারণ-ই কর্মফল রূপ প্রদান করে, অর্থাৎ পুনর্জন্ম দান করে। 'অকর্ম ভাব'ই নিষ্কাম আর কালাতীত হয়। কামনা যুক্তকর্ম আমাদের কালচক্রে আবদ্ধ করে, আর নিষ্কাম কর্ম আমাদের কালের গণ্ডি পার হয়ে যেতে সাহায্য করে। অহংকৃত ভাবই কালের চক্রে জীবকে আবদ্ধ করে রাখে। ফলে বাসনাই জীবকে জীবনচক্রে বেঁধে রাখে। বাসনাহীনতাই নিষ্কাম কর্ম। এটাই জীবকে কালতীত করে তোলে। অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম দ্বারাই কালের নিবৃত্তি হয়। 'নিষ্কাম দর্শন' এই জীবনেই করে নেওয়া উচিৎ তাহলেই জীবন সফল হয়; না হলে বিফলে যায়। যখন আমরা ভগবৎ জ্ঞান দ্বারা একটি পাথর থেকে ভগবান প্রকট করতে পারি তাহলে কি চেতনাযুক্ত জীবের মধ্য থেকে আত্ম বা পরমাত্ম তত্ত্বকে ব্যক্ত করতে পারি না? কোন মানুষ তার দিব্য স্বরূপে স্থিত হয়ে নিঃসংকল্পভাবে কর্ম করলে তবেই কালের উপর বিজয়প্রাপ্ত হয়। এই নিষ্কাম প্রাপ্তি কেবলমাত্র অসীমের পরম পিতা পরমাত্মাকে দিব্য জ্ঞানের আর যোগের দ্বারা জানার পরই সম্ভব হয়।

২. ১৪টি লোকের বর্ণনা

এটা ১৪টি 'লোক' দিয়ে তৈরি একটি ব্রাহ্মাণ্ড। যে ভূলোকে আমাদের ভারতবর্ষ অবস্থিত। এই ভূলোকটি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থানরত। এটা ১৪ লোকের ব্রহ্মাণ্ড উত্তর থেকে দক্ষিণ (vertical) ৬০ কোটি যোজন। পূর্ব থেকে পশ্চিমে (Horizontal) ৫০ কোটি যোজন। পুরোটা মিলে ৩০ দিন আলোকবর্ষ। ১ যোজন = ৪ মাইল। ৩০×২৪×৬০×৬০×৩,০০০০০ = ৭,৭৭,৬০,০০,০০,০০০ ; ৩০ দিনকে সেকেন্ড বানানো হয়েছে তারপর ওই সেকেন্ডকে ৩ লাখ কিলোমিটার দিয়ে গুণ করা হয়েছে। কারণ প্রকাশের গতি ১ সেকেন্ডে ৩ লাখ কিলোমিটার।

১৪ ভুবনের পরিমাণ (বিস্তার) = ৭ খারব ৭৭ আরোব ৬০ কোটি কিলোমিটার।

ব্রহ্মা পুরীতে সূর্যের আলো যায়, বিষ্ণু আর শিব পুরীতে পৌছায় না। তাই এগুলি ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে ধরা হয়। শিবপুরী বা রুদ্রলোকের উপরে আছে পরমধাম।

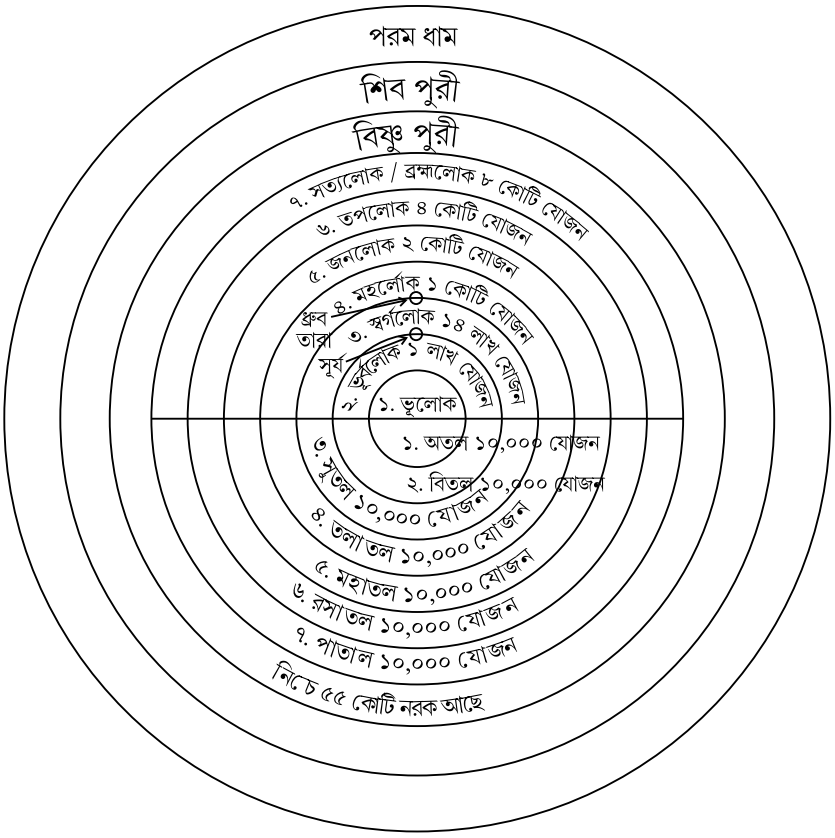

চিত্র - ১ (ব্রহ্মাণ্ড বা Solar System)

৯টি গ্রহের স্থিতি ১৪ ভূবন-এর (১৪টি লোক) বর্ণনা

৭টি লোক বিষ্ণুর নাভির উপরিভাগে অবস্থিত। ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপলোক আর সত্যলোক (ব্রহ্মলোক)-এর গতি উর্দ্ধদিকে। নাভির নিচের দিকে ৭টি লোক যথাক্রমে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল আর পাতাল।

শিশুমার চক্র (গৌ-এর আকারের এক তারাদের সমষ্টি)-এর লেজের প্রথম দিকে আছে ধ্রুব।

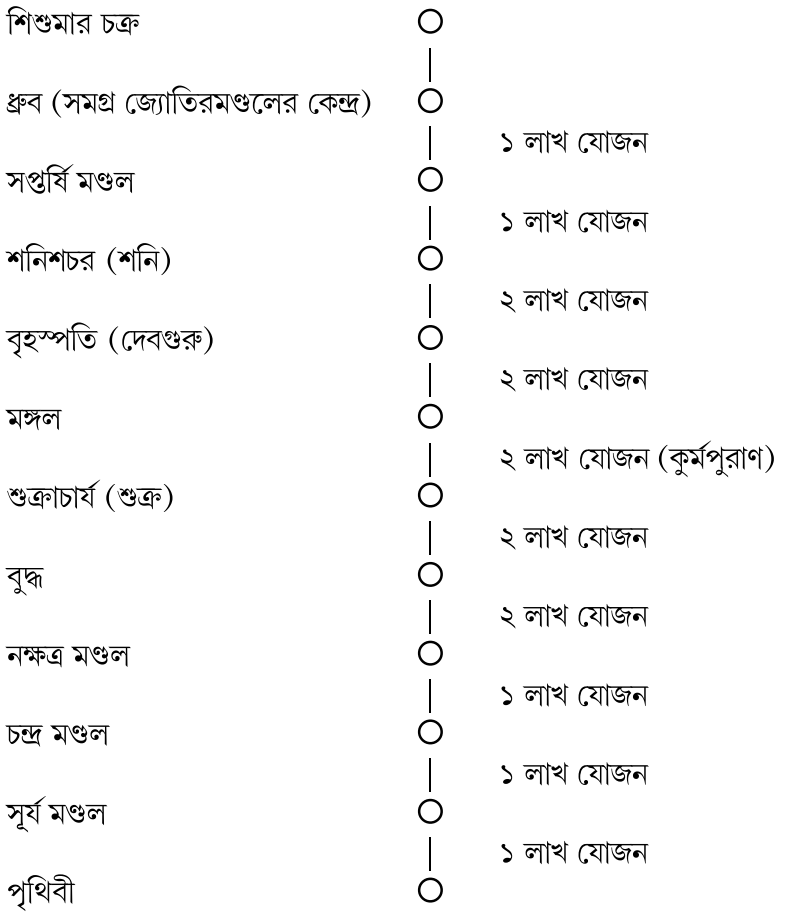

ভূমি থেকে সূর্যমণ্ডলের দূরত্ব এক লাখ যোজন। সূর্যের ব্যাস ৯ হাজার যোজন। এর থেকে ৩ গুণ বেশি (২৭,০০০ যোজন) সূর্যের বিস্তার। সূর্য থেকে চন্দ্রমণ্ডলের দূরত্ব ১ লাখ যোজন। চন্দ্রমণ্ডলের সীমানা সূর্যের সীমানা থেকে ২ গুণ বেশি। চন্দ্র থেকে ১ লাখ যোজন দূরত্বে সম্পূর্ণ নক্ষত্রমণ্ডল প্রকাশিত। নক্ষত্রের সংখ্যা ৮০ সমুদ্র ১৪ আরব ২০ কোটি (স্কন্ধ পুরাণ, পৃষ্ঠা ১৩৬)। বায়ু পুরাণে ১৮টি সংখ্যার পরিমাপের নাম হল

পরার্ধ	অন্ত	মধ্য	সমুদ্র	পদ্ম	শঙ্খ	নিখর্ত	খরব	বৃন্দ	ন্যর্বুদ	অর্বুদ
০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

প্রযুত	নিযুত	অযুত	সহস্র	দশক	একক
০	০	০	০	০	০

নক্ষত্রমণ্ডল থেকে ২ লাখ যোজন উপরে চন্দ্র পুত্র বুদ্ধের স্থান। বুদ্ধ থেকে ২ লাখ যোজন উপরে শুক্রের (শুক্রাচার্য) স্থান। শুক্র থেকে ২ লাখ যোজন উপরে মঙ্গলের স্থান। তার থেকে ২ লাখ যোজন উপরে দেবগুরু বৃহস্পতির স্থান। বৃহস্পতির থেকে সুবর্ণ বা হলুদ রং-এর উৎপত্তি হয়। বৃহস্পতির থেকে ২ লাখ যোজন পরে শনিশ্চরের স্থান। শনির থেকে ১ লাখ যোজন দূরত্ব আছে সপ্তঋষি মণ্ডল। এর থেকেও ১ লাখ যোজন দূরত্বে ধ্রুবের স্থিতি। ধ্রুব উত্থানপাদের পুত্র। ধ্রুবই সমস্ত জ্যোতির্মণ্ডলের কেন্দ্র। ইনি শিশুমার চক্রের লেজের প্রথম ভাগে অবস্থান করেন। এই সমস্ত জ্যোতির্মণ্ডল বায়ুরূপী সূত্র দ্বারা ধ্রুবের সঙ্গে বাধা আছে। আকাশে শিশুমার একটি গরুর আকারের তারামণ্ডল। ধ্রুব স্বয়ং নিজের পরিধিতে ঘুরন্ত অবস্থায় বিরাজমান। সূর্য চন্দ্র তারা নক্ষত্র আর গ্রহগণ সকলই ধ্রুবের কেন্দ্রের সাথে বাঁধা অবস্থায় আছে। শিশুমারের আধার হল বিষ্ণু। ধ্রুব পৃথিবীতে ১০,০০০ বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। সূর্যের নীচে অবস্থান করে রাহু। শুক্রাচার্যের মণ্ডল চন্দ্রমার ১৬ ভাগের সমান। বৃহস্পতির বিস্তার শুক্রাচার্যের থেকে এক চতুর্থাংশ কম। ঠিক এই রকমই মঙ্গল, শনি আর বুধ বৃহস্পতির তুলনায় এক চতুর্থাংশ কম। নক্ষত্রমণ্ডলের পরিমাপ ৫শ, ৪শ, ৩শ, ২শ, ১শ যোজন থেকে নিয়ে কম করে আধা যেজন পর্যন্ত হয়। এর থেকে ছোট কোন নক্ষত্র নেই।

পৃথিবীতে যেখানে হেঁটে যাতায়াত করা যায় সেটাকে ভূলোক বলে। যমরাজ পুরী মনুষ্যলোক থেকে ৮৬০০০ যোজন দূরত্বে আছে। এই মহামার্গ দিয়েই প্রেত যমলোকে যায়। এই পথে ভয়ঙ্কর বৈতরণী পরে। বরাহ পুরাণ অনুসারে যমলোক ৪,০০০ যোজন লম্বা আর ২,০০০ যোজন চওড়া। এই নগরে বিশাল রাজপথ আছে। সেই পথে অনেক প্রকার বাহন যাতায়াত করে। সুন্দর সুন্দর মহল আর অট্টালিকা আছে। পুণ্য আত্মাগণের নিকট যমরাজের চেহারা বিষ্ণুর মত দেখতে লাগে। আর পাপাত্মাদের কাছে তা ভয়ানক রূপে দেখা দেয়। যমরাজের দূত যখন যমরাজের কাছে নিয়ে যায়, তখন যমরাজ মানুষের সূক্ষ্ম শরীর দেখে বিচার করেন এবং পুণ্যাত্মাদের তাঁদের কর্ম অনুসারে স্বর্গ বা তার উপরের কোনো লোকে পাঠিয়ে দেন। পুণ্য কর্মকারী জীবদের প্রতি যমরাজ খুব খুশি থাকেন আর স্বর্গে যাবার সময় তাঁদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার করেন কিন্তু পাপ কর্মকারীদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ভয়ানক থাকে আর তাদের নিচু কোনো লোকে বা ৫৫ কোটি নরকের কোনো একটিতে পাঠিয়ে দেন। যমরাজকে সাবিত্রী বস করেছিলেন। প্রথমে ওনার থেকে নিজের অন্ধ মাতাপিতার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনেন আর তারপর নিজের স্বামী সত্যবানকে মৃত্যুপাশ থেকে ছাড়িয়ে এনে তার আয়ুও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এখন যম ও ওনার দূতগণ সবাই মানুষ হয়ে গেছেন। মানুষ এখন নিজের কর্মফল স্বয়ংই ভোগ করে। ভূমি আর সূর্যের মধ্যবর্তী লোককে ভুবর্লোক বলে। সূর্য পৃথিবী থেকে ১ লাখ যোজন দূরে অবস্থিত। ধ্রুবতারা আর সূর্যের মধ্যবর্তী দূরত্ব ১৪ লাখ যোজন যেটাকে স্বর্গলোক বলা হয়। ধ্রুবের উপরে ১ কোটি যোজন পর্যন্ত আছে মহর্লোক। তার উপরে ২ কোটি যোজন পর্যন্ত জনলোকের বিস্তার। তার উপরে ৪ কোটি যোজন পর্যন্ত আছে তপলোক। তারও উপরে ৮ কোটি যোজন পর্যন্ত আছে সত্যলোক যাকে আমরা ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মলোক বা ব্রহ্মাপুরী বলি। ভুবর্লোক হল সিদ্ধ মুনিদের দ্বারা সেবিত প্রদেশ। স্বর্গলোকে আছে কল্পবৃক্ষ। কল্পবৃক্ষের নীচে যে যেটা ইচ্ছা করত সেটাই পেয়ে যেত। কল্পবৃক্ষ থেকে

মদিরা বের হত সেটা পান করে নিত। স্বর্গলোকে ইন্দ্রাদি দেবতারা থাকেন। যাঁরা ভালো কর্ম করেন তাঁরা উর্দ্ধদিকে উন্নতলোকে সঞ্চালিত হন। উর্দ্ধলোকে বা তার থেকেও উপরে সুখী জীবন ব্যতীত করেন। বেদাদি শাস্ত্রে বর্ণিত যজ্ঞ, হোম, যপ, দান, তীর্থ অথবা অন্যান্য কর্মের দ্বারা ৭টি লোকের সাধ্য হয়ে যান। তাঁরা উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হন। ভূ-ভুব-স্বর্গ এই তিনটি লোকই অনিত্য। জন-তপ আর সত্যলোক হল অবিনশ্বর। নশ্বর আর অবিনশ্বরের মাঝখানে অবস্থিত মহর্লোক। কলি যুগের শেষে যখন মহা প্রলয় হয় তখন তিনটি লোকের সত্তা নষ্ট হয়ে যায় মহর্লোক জনশূন্য হয়ে যায় কিন্তু তার সম্পূর্ণ বিনাশ হয় না। সূর্যের আলোক তিন লোকে যায়। ধ্রুবের উপর হতে যে স্থানটি আছে সেখানে সূর্য, নক্ষত্র বা তারা কিছুই উদয় হয় না। সেখানে লোক নিজের তেজ আর নিজস্ব শক্তিতেই প্রকাশিত হয়ে স্থির থাকে। ধ্রুব ও নিজস্ব তেজে প্রকাশমান। যতটা পৃথিবীর পরিমণ্ডল বা ঘের ঠিক ততটাই ভুবর্লোকের বিস্তৃতি। মহোর্লোকে ভৃগু, সপ্তঋষি আদি সিদ্ধ পুরুষেরাই থাকেন। ওখানে মহর্ষি বা মহাত্মারাই থাকেন। যাদের আয়ু একটি কল্পের হয়। জনলোকে ব্রহ্মার মানস পুত্র সনকাদি নির্মল মনের আত্মা এবং ধ্রব আদি নিবাস করেন। ধ্রুব পৃথিবীতে ১০,০০০ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তপলোকে বৈরাজ নামের দেবতারা বাস করেন যারা সদাপ্রসন্ন, সন্তাপ আর দুঃখহীনভাবে বিরাজ করেন। সত্বলোক বা ব্রহ্মালোকে অবিনশ্বর বা অমর লোকেরা বাস করেন। এখানেও আলাদা আলাদা স্টেজ-এর সূক্ষ্ম আত্মা থাকেন যারা ব্রহ্মার থেকে ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে ব্রহ্মার সমান হয়ে যান।

পাতাল লোকের বর্ণনা

ভূমির উচ্চতা ৭০,০০০ যোজন। এর ভিতর ৭টি পাতাল আছে। যেটা একে অন্যের থেকে ১০,০০০ যোজন দূরত্বে অবস্থান করে। সেখানকার ভূমি সুন্দর। অট্টালিকা দ্বারা সুশোভিত। সেখানকার ভূমি শুক্র, কৃষ্ণ, অরুণ, পীতবর্ণ, কর্কশময় প্রস্তরময় আর স্বর্ণময়। যেখানে দানব দৈত্য, যক্ষ আর বিশাল বিশাল নাগেদের হাজার হাজার প্রজাতি আছে। ওই পাতালগুলোতে গরম, ঠান্ডা বা বর্ষা বলে কিছু নেই। কোনো কষ্টও নেই। যেখানে দিনে সূর্য প্রকাশ হয় কিন্তু রোদ বা ঘাম এসব হয় না আর রাতে চাঁদের আলোয় আলোকিত হয় কিন্তু শৈত্য দেয় না। যেখানে ভক্ষণ, ভোজন, মহাপানাদির ভোগের আনন্দ আছে। এখানে সময়ের গতি বোঝা যায় না। এখানে সুন্দর সুন্দর বন, নদী, সরোবর আর পদ্মের বন বিরাজমান। যেখানে নর কোকিলের সুন্দর কুঞ্জন ধ্বনিত হয়। আর আকাশ এখানে মনোহারী। এখানে পাতাল নিবাসী দৈত্য, দানব এবং নাগগণ, অতি স্বচ্ছ আভূষণ, সুগন্ধি এবং বীণা বেণু, মৃদঙ্গ, তূর্য এ সকলের আনন্দ গ্রহণ করে যা কিনা কেবল ভাগ্যশালীরাই ভোগ করতে পারে। ৭ম পাতাল-এ হাটকেশ্বর শিবলিঙ্গ আছে। যার স্থাপনা স্বয়ং ব্রহ্মার দ্বারা হয়েছে। সেখানে নাগরাজেরা তার পূজা করেন। পাতালের নিচে প্রচুর জল আছে। তার নিচে আছে ৫৫ কোটি নরক লোক। যেখানে পাপীদের নিক্ষেপ করা হয়। বিষ্ণুলোক আর রুদ্রলোক (শিবপুরী) এই ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে (নতুন স্কন্ধ পুরাণ, পৃষ্ঠা ১৩৯)।

৩. আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি কি করে হল ?

ব্রহ্মাণ্ডের রচনা শিবের দ্বারা হয়েছে। মহা ব্রহ্মাণ্ডের রচনা মহাশিব-এর দ্বারা হয়েছে। পরম মহা ব্রহ্মাণ্ডের রচনা পরম মহাশিবের দ্বারা হয়েছে। শিব হল একটি তত্ত্ব যাকে শিবত্ব ও বলা হয়। এটা কালের রূপেরই বিশেষণ। মহাশিব মহাকাল রূপ ধারণ করেন আর পরম মহাশিব পরম মহাকালরূপ ধারণ করেন।

শিব কেই পরমআত্মা বলে। শিবকে কালতত্ত্বও বলা হয়। কাল মানে 'সময়'। কাল একটি অচেতন তত্ত্ব। কাল = রুদ্ররূপ ধারী।

শিবের জন্ম হয় পরমতত্ত্বে তাই শিবকে পরমাত্মা বলা হয়। যাঁদের জন্ম পরম তত্ত্বে হয় তাঁরা সবাই পরমাত্মাই হয়। শিব নিরাকারী এবং আকারী দুটি রূপেই বিরাজমান। শিব হ'ল পরমত্বা এবং একটি তত্ত্ব। তাই তাঁকে শিবত্বও বলা হয়। শিব রুদ্ররূপ ধারী হয় (চিত্র নং ২ দেখুন)।

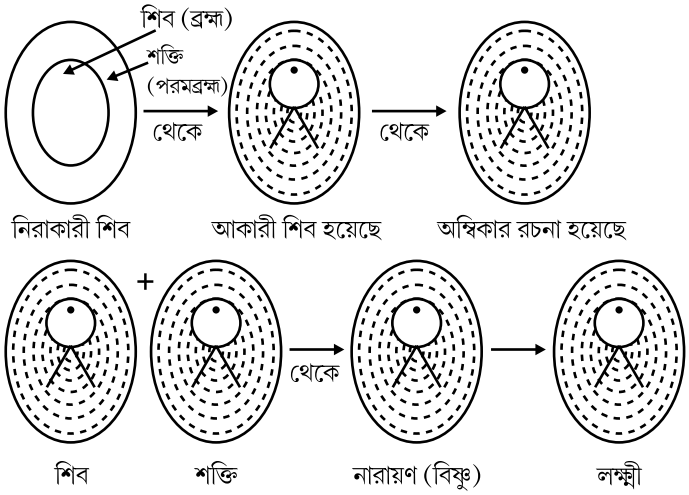

চিত্র - ২

চিত্র - ৩

চিত্র - ৪

বেদান্ত দর্শনে বলা হয়েছে যে, পরমব্রহ্মের ইচ্ছা হল যে, আমি এক থেকে অনেক হয়ে যাই। তখন শিবের দ্বারা অম্বিকা (শক্তি)-র রচনা হল। তারপর আকারী শিব + শক্তি থেকে বিষ্ণুর উৎপত্তি হয়। বিষ্ণু অর্থাৎ নারায়ণ। 'নার' মানে জল আর 'আয়ন' মানে 'স্বারী' (নিবাসস্থান)। বিষ্ণুকে ক্ষীরসাগরে দেখানো হয়।

বিষ্ণুর শক্তি থেকে একটি পিন্ডের উৎপত্তি হল। এই পিন্ডটাই ব্রহ্মার শরীর অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ড তৈরি হল। এই পিণ্ডটার দুটি ভাগ হ'ল। উপরের ভাগটি ভুবর্লোক আর নিচের ভাগটি ধরনী তৈরি হল। ব্রহ্মার দ্বারা উৎপত্তি হল সপ্ত ঋষির সপ্তঋষিদের থেকে উৎপত্তি হল মনু আর শতরূপার। মনুশতরূপার থেকে হ'ল প্রজাপতি। প্রজাপতির থেকে উৎপত্তি হল দেবতাগণের (চিত্র নং ৪ দেখুন)।

দেবী-দেবতাগণের থেকে তাদের পুত্র কন্যাদের উৎপত্তি হল। এইভাবে বংশপরম্পরায় বৃদ্ধি হতে থাকল। শিবের থেকে সময়ের উৎপত্তি হয়েছে তাই শিবকে কালতত্ত্বও বলে। কাল একটি অচেতন বস্তু। এটি আত্মশক্তির দ্বারা গতিশীল থাকে। যখন শিবের পজিটিভ পাওয়ার থাকে তখন সেটা শিবত্ব হয়। তখন উনি ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করেন। যখন উনি ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের মধ্যে প্রবেশ করাতে চান তখন কালাগ্নি বর্ষণ করে রুদ্ররূপ ধারণ করে নেন। তখন উনি ব্রহ্মাণ্ডকে গুটিয়ে নিয়ে নিজের আকরী স্বরূপের যে রোমকূপ থেকে ওই ব্রহ্মাণ্ড বানিয়েছিলেন, সেই ব্রহ্মাণ্ডকে একটি সেল এ পরিণত করে ওই রোমকূপের মধ্যে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই কারণে শিবকে কালতত্ত্বও বলা হয়। তখন তার মধ্যে নেগেটিভ শক্তি এসে যায় আর তাই তিনি জ্বলতে থাকেন। তখন উনি নিজেকে চার্জ করার জন্য মহাশিবের মধ্যে বিলীন হয়ে যান। শিব আর ওনার সহযোগিনী শক্তিই হল ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা। আমাদের ব্রহ্মাণ্ড হল যাতে আমাদের ভারতবর্ষ আছে। এমন অনন্ত অনন্ত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে (পরলোক আর পুনঃর্জন্মের পুরনো পেজ নং ২ আর ৩ নতুন পেজ নং ৬ আর ৭)। অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই সংসারে এক এক ব্রহ্মাণ্ডতে অনন্ত অনন্ত জীব আছে। এক একটি জীবের অনন্ত অনন্ত জন্মের অনন্ত অনন্ত কর্ম আছে। অনন্ত অনন্ত কর্মের মধ্যে এক একটি কর্মের অনন্ত ফল আছে। যে ভূলোকে আমাদের ভারতবর্ষ আছে সেটি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। [পরলোক আর পুনর্জন্ম—পেজ নং ৩৭৭ (পুরোনো)/পেজ নং ৩৮৫ (নতুন)]

অনন্ত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আর অনন্ত কোটি কোটি পরম তত্ত্ব আছে। এরই জন্য অনন্ত কোটি কোটি রঙ বা কালার কম্বিনেশন আছে। আকৃতি, প্রকৃতি, নক্সা, রূপ রং ও অনন্ত। ওখানকার কল্পনা করাও মুশকিল

কারণ প্রত্যেকটি ব্রহ্মাণ্ডতে আলাদা আলাদা পরমতত্ত্ব আছে। কোনোটাই কারো সাথে মিল খায় না (দৈবী ভাগবত পৃষ্ঠা ৬৫১)। এক একটি ব্রহ্মাণ্ডতে আলাদা আলাদা ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শিব আছেন (দেবী ভাগবত পৃষ্ঠা ৬৩৯)। মহাকালের মহাবিরাট রূপের রোমকূপের মধ্যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান (পরলোক আর পুনর্জন্ম, পেজ নং ৩৮৯ পুরানো, আর পেজ নং ৪০৬ নতুন)। এক পাদ মায়া বিভূতিতে আছে, একই সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি আর বিনাশ হয়। যুগ মানে সময়ের অনুপাত, প্রতি মুহূর্ত মানে প্রতি সেকেন্ড। মহাবিষ্ণুর এক সেকেন্ড = মহাকল্পের পুরো সময় = ব্রহ্মার ১০০ বছর = ৩৬,০০০ যুগ। এক যুগের সময় (দিন + রাত) = ৮,৬৪,০০,০০,০০০ মানুষের বছর = ব্রহ্মার ১ রাতদিন = আট আরত চৌষট্টি কোটি বছর (পরলোক আর পুনর্জন্ম, পেজ নং ৩৮৯ পুরানো, পেজ নং ৪০৭ নতুন)। প্রকৃতির অন্তর্গত সকল লোককে কালরূপ অগ্নির দ্বারা প্রলয়কালে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আমরা যে ব্রহ্মাণ্ডে থাকি, বিষ্ণুলোক আর রুদ্রলোক তার বাইরে তৈরি করা হয় (স্কন্দপুরাণ, পেজ নং ১৩৯)।

Galaxy বা মহাব্রহ্মাণ্ডের বর্ণনা (চিত্র নং-৫)

মহাশিব হ'ল মহা ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা। নিচে মহা ব্রহ্মাণ্ডের স্টাকচার ছবির আকারে দেখানো হয়েছে। মধ্যস্থলে মহাব্রহ্মাণ্ডের মহা পরম ধামকে দেখানো হয়েছে। এই মহা পরমধামের উপরের ঘেরার মধ্যে মহাশিব আর মহাশক্তি থাকেন। মহাশিব আর মহাশক্তিকে মহাকাল আর মহাকালীও বলা হয়। মহাশিব আর মহাশক্তিকে মহা পরমাত্মা বলে।

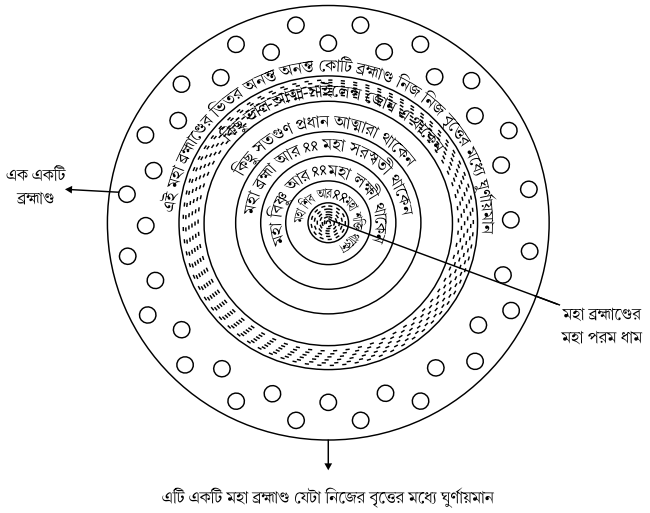

চিত্র - ৫ (মহাব্রহ্মাণ্ড বা Galaxy)

মহাশিব আর মহাশক্তি এই মহাব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা। এই রকম অনন্ত মহা ব্রহ্মাণ্ড আছে। এর পরের একটি বৃত্তে মহাবিষ্ণু আর মহালক্ষ্মী থাকেন। তার পরের বৃত্তে মহাব্রহ্মা আর মহা সরস্বতী থাকেন। তারও পরের বৃত্তে কিছু সতগুণ প্রধান আত্মারা থাকেন। আর তার পরের বৃত্তে কিছু ভাল ভাল আত্মারা সাইলেন্স জোনে থাকেন। এর উপরে যে বড় বৃত্ত দেখানো হয়েছে। এই বৃত্তের মধ্যে অনন্ত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড নিজ নিজ অক্ষের মধ্যে ঘুরছে।

Universe বা পরম মহা ব্রহ্মাণ্ডের থেকে মহা ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়। ওই মহাব্রহ্মাণ্ডের থেকে আমাদের ব্রহ্মাণ্ড নেমে এল। যে ব্রহ্মাণ্ডের ভূলোকে আমাদের ভারতবর্ষ অবস্থিত। চিত্র নং ১ দেখুন, যেটা আমাদের ভারতবষের ব্রহ্মাণ্ড সেটা হল অসীম পরম ধামের সেন্টার। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, মহাব্রহ্মাণ্ড আর পরম মহা ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে ঘেরা। এই সকল অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, মহাব্রহ্মাণ্ড আর পরম মহাব্রহ্মাণ্ড আমাদের ভুলোক তথা ভারতবর্ষস্থিত ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে নিজ নিজ কক্ষে ঘুরছে। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডটি সবার আগে আমাদের মহাব্রহমাণ্ডের (আকাশগঙ্গা/ Galaxy) মহাশিব তাঁর সঙ্কল্প দ্বারা আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের শিবকে বলেন এবং আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের শিব ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করান। এই প্রকার মহাশিবের প্রতিনিয়ত অনন্ত অনন্ত কোটি শিব আর শক্তির দ্বারা অনন্ত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তৈরি এবং ধ্বংস হয়ে চলেছে। সবার প্রথমে আমাদের ভারতবর্ষ ওয়ালা ব্রহ্মাণ্ড তৈরি হয়েছিল এবং সেটি সবচেয়ে বেশি সতগুণসম্পন্ন ছিল।

মহা ব্রহ্মাণ্ড বা Galaxy ও নিজের বৃত্তের মধ্যে ঘূর্ণায়মান আছে। আর এই মহাব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা হলেন মহাশিব। ওনার প্রতিটা রোমের মধ্যে এক একটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। মহাশিবের শক্তি অনন্ত, উনি স্বয়ং মহাকাল হয়ে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে ১ সেকেন্ডের মধ্যে নিজের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নেন। মহাকালের নিরিখে প্রতি মুহূর্তে অনন্ত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তৈরি আর ধ্বংস হয়ে চলেছে। এই মহাকাশে সময়ের পরিমাপ ক্ষেত্রপরি পরিবর্তিত হয়। যখন মহা ব্রহ্মাণ্ডের পাওয়ার শেষ হয়ে যায় তখন মহাশিব মহাকাল হয়ে (Super Massive black hole) কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে তার গভীরে টেনে নেন। সবার আগে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের (Soler System) পাওয়ার বা ক্ষমতা শেষ হবে। তখন আমাদের শিব সূর্যের মধ্যে প্রবেশ করে কালাগ্নিস্বরূপ হয়ে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডকে জালিয়ে দেবেন। যখন মহাশিব আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের শিবের দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়েছিলেন তখন তাঁর মধ্যে Positive power ছিল। তাই তিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন কিন্তু যখন তাঁর সম্পূর্ণ ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে তখন তিনি Negative power এ পরিবর্তিত হবেন। এইভাবে যখন Galaxy-র প্রতিটি শিব তাঁদের নিজস্ব ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের ভিতরে ঢুকিয়ে নেন (Compression) তখন সম্পূর্ণ Galaxy নেগেটিভিটিতে ভরে যায়। আর যখন মহাশিব (Galaxy-র মালিক) সেই নেগেটিভ পাওয়ারগুলো তার মধ্যে টেনে নেন তখন তার পাওয়ারও শেষ হয়ে যায় আর তখন তিনি নিজেও জ্বলে যান। এর পর তিনি তাঁর নিজস্ব পাওয়ার চার্জ করার জন্য, নিজে যার থেকে সৃষ্টি হয়েছিলেন সেই পরম

মহাশিবের (Universe-এর মালিক) মধ্যে প্রবেশ করেন। এইভাবে উত্তরোত্তর প্রক্রিয়া চলতে থাকে। পরম মহাশিবের এক একটি রোমকূপের মধ্যে অনন্ত অনন্ত শিব সহিত এক একটি মহাশিব বিলীন হয়ে যান, যেখান থেকে তাঁরা সৃষ্টি হয়েছিলেন। বিজ্ঞানের ভাষায় বুঝতে গেলে, ধ্বংসের কালে প্রথমে সৌরমণ্ডল তারপর Galaxy, তারপর Universe আর তারপর Maltiverse এইভাবে compressed হতে থাকে। এ সকল অচেতন বস্তু হলেও, যাঁরা এ সকল কার্য পরিচালনা করেন তারা হচ্ছেন চেতন শক্তি যাদের নাম শিব, মহাশিব, পরম মহাশিব, পরম পরম মহাশিব, এইভাবে Category বারতে থাকে। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের মত এমন প্রচুর প্রচুর ব্রহ্মাণ্ড আছে যা বিরাট একটি পুরুষ রূপের মধ্যে সমাহিত।

Universe বা পরম মহা ব্রহ্মাণ্ডের বণনা (চিত্র-৬)

কিছু কমজোরি আত্মা যাদের জন্ম ধরনীর থেকে ১৫০ আরব প্রকাশ বর্ষেরও উপরে পরমতত্ত্ব (পরম অগ্নি আর পরম বায়ুর) এর থেকে ৮.৫ কলা (power) থেকে ৮.১ কলার মধ্যে হয়েছিল, তাদের মধ্যে দুটি ভাগ হয়ে গেছিল। তার মধ্যেও কিছু শ্রেষ্ঠ পরমতত্ত্বের আত্মা ছিলেন যাদের মধ্যে পরমতত্ত্বের মাত্রা ছিল ১০০% তারা অধিক শক্তিশালী হবার কারণে উপরের স্তরে উড়ে বেড়াতেন। আর যাদের মধ্যে পরমতত্ত্বের ভাগ একটু কম ছিল তারা ওনাদের থেকে একটু কম শক্তিশালী হবার কারণে তাদের নিচে নামতে ভাল লাগত। সেখান থেকে সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে করতে আরো নিচে নেমে আসতে থাকে। যে পরম মহাব্রহ্মাণ্ডেরও মহা ব্রহ্মাণ্ডতে আর মহাব্রহ্মাণ্ডের যে ব্রহ্মাণ্ডে তারা থাকতেন ওই পরম মহাব্রহ্মাণ্ডই সবার আগে নিচে চলে এসেছে। চিত্র নং ৬ দেখুন, এইরকম অনন্তকোটি পরম মহাব্রহ্মাণ্ড হবে। এদের রচয়িতা পরম মহাশিবগণ মোটামুটি সবাই ধরনীতে চলে এসেছেন। এইসব পরম মহা ব্রহ্মাণ্ড যার যার নিজস্ব বৃত্তের মধে ঘুরছিল তখনই কিছু পরম আকাশ তত্ত্ব নেমে আসে। সবার আগে আমাদের পরম মহাব্রহ্মাণ্ড নিচে নেমে এসেছিল যার মধ্যে আমাদের ব্রহ্মাণ্ড ছিল। ওই পরমমহাব্রহ্মাণ্ড থেকে আমাদের মহা ব্রহ্মাণ্ড নেমে এসেছিল যেখানে আমাদের ভারতবর্ষ তৈরি হয়েছিল। ওই মহাব্রহ্মাণ্ড (Galaxy) থেকে আমাদের ব্রহ্মাণ্ড (Solar System) সৃষ্টি হল যেখানে আমাদের ভূলোক বা পৃথিবী অবস্থিত। (চিত্র নং-১ দেখুন, এটাই আমাদের ভূলোকের ভরতবর্ষওয়ালা ব্রহ্মাণ্ড যেটা অসীমের পরম ধামের সেন্টার বা কেন্দ্র। এই আমাদের ব্রহ্মাণ্ড (Solar System) অনন্ত অনন্ত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, মহা ব্রহ্মাণ্ড (Galaxy) আর পরমমহাব্রহ্মাণ্ড (Universe) দিয়ে ঘেরা রয়েছে। এই সকল অনন্ত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, মহাব্রহ্মাণ্ড, পরম মহাব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি আমাদের ভারতবর্ষওয়ালা ব্রহ্মাণ্ডের চারদিকে নিজের নিজের বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত হয়ে চলেছে।

চিত্র নং-৬, এই পরম মহাব্রহ্মাণ্ডের (Universe) রচয়িতা, পরম মহাশিব। পরমমহাশিবকে পরম মহাপরমাত্মা বলে। এই পরম মহা ব্রহ্মাণ্ডের ঠিক মাঝখানে পরম মহাপরমধাম দেখানো হয়েছে। এই পরম

মহা পরমধামের ভেতরের দিকের বৃত্তে পরম মহাশিব এবং পরম মহাশক্তি থাকেন। যাঁরা ওই পরম মহাব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা। এর পরের বৃত্তে মহাশিব অর মহাশক্তি থাকেন। তার পরের বৃত্তে কিছু ভালো আত্মারা সাইলেন্স জোনে থাকেন। তারও পরের বৃত্তের মধ্যে অনন্ত অনন্ত কোটি মহাব্রহ্মাণ্ড নিজ নিজ বৃত্তে ঘুরছে। যাদের রচয়িতা মহাশিব এবং মহাশক্তি। সকল আলাদা আলাদা মহা ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা আলাদা আলাদা মহাশিব এবং মহাশক্তি। এই পরম মহাব্রহ্মাণ্ডটাও নিজস্ব বৃত্তের মধ্যে ঘূর্ণায়মান। এই পরম মহাব্রহ্মাণ্ডের কখনো বিনাশ হয় না। আমাদের ভারতবর্ষের ব্রহ্মাণ্ডটি অনন্ত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থল। যে ব্রহ্মাণ্ডে (Solar System) আমাদের পৃথিবী তৈরি হয়েছিল, তার পরম মহা ব্রহ্মাণ্ডটি সবার প্রথমে স্থুল রূপ ধারণ করে এবং সবার আগে সেটিই নিচে নেমে আসে।

এরকম মোটামুটি ৫০০ কোটির মত পরম মহাব্রহ্মাণ্ড আছে। এই সকল ৫০০ কোটি পরম মহাব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা ৫০০ কোটি পরম মহাশিব। এক একটি পরমমহাব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা আলাদা আলাদা পরম মহাশিব এবং পরম মহাশক্তি। এই সকল পরম মহাশিবেরাই পরম মহান পরমাত্মা। পরম মহা ব্রহ্মাণ্ড মানে Universe (ইউনিভার্স)। এক একটি ইউনিভার্সের মধ্যে রয়েছে অনন্ত কোটি Galaxy (মহা ব্রহ্মাণ্ড), আর এক একটি মহাব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মানে Solar System নিজ নিজ বৃত্তের মধ্যে ঘুরে চলেছে। এই সকল ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা হলেন 'শিব'। এরকম অনন্ত অনন্ত কোটি যত ব্রহ্মাণ্ড আছে তাদের প্রত্যেকের স্রষ্টা আলাদা আলাদা এক 'শিব'।

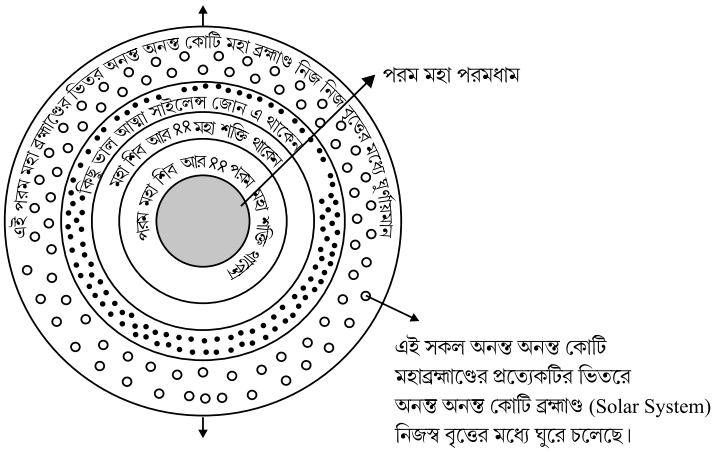

এটি একটি পরম মহাব্রহ্মাণ্ড (Universe) যেটা নিজস্ব বৃত্তের মধ্যে আবর্তন করছে।

চিত্র - ৬
পরম মহাব্রহ্মাণ্ড (Universe)

৫০০ কোটি পরম মহাশিব আর পরম মহাশক্তির রচয়িতা ৬.৫ কোটি। পরম পরম মহাশিব। ৬.৫ কোটি পরম পরম মহাশিবের রচয়িতা ২ কোটি মূল বসতী স্থাপনকারী। ওই ২ কোটি বসতী স্থাপনকারীর রচয়িতা ৯ লাখ পরমধামবাসী। ওই ৯ লাখ নিরাকারী আত্মার রচয়িতা ১৬,১০৮ পরমধামবাসী। ওই ১৬,১০৮-এরও রচয়িতা ১০০৮ যারা বিষ্ণুর মালার মধ্যে আসবেন। ওই ১০০৮ এর রচয়িতা ১০৮ বীজ রূপ মালার আত্মা। ওই ১০৮ আত্মাই পদ্মাপদম মহাশিব। এই ১০৮-এরই রচয়িতা আসীমের পরম পিতা মাতা। আর ওনারাই অসীমের 'মহাশিব' আর 'মহাশক্তি'। এনারাই অসীমের মহাকাল আর মহাকালি যাঁরা কিনা এই অসীমের সৃষ্টির (পরমধাম + মূল বসতী + সূক্ষ্ম বসতী + স্থূল বসতী) প্রধান রচয়িতা। অসীমের পরম পিতামাতা একটাই জন্মের জন্য মনুষ্যরূপ ধরে এই পৃথিবীতে এসেছেন সকল সীমা ও অসীমের সৃষ্টিকে ব্যক্ত থেকে অব্যক্ততে রূপান্তরিত করার জন্য। এনাদের জন্ম দিব্য এবং অলৌকিক।

অসীমের মহাকাল, ভূত বা অতীতের সংহারকারী, অসীমের রুদ্ররূপ ধারণ করে, এই সকল অনন্তানন্ত কোটি কোটি পরম মহা ব্রহ্মাণ্ড (Universe) কে ৮.৫ কলা (power) থেকে অসীমের পরম অগ্নিতত্ত্ব বর্ষণ করে, আর কালাগ্নিতে ভস্মিভূত করে, নিজের মহাবিরাট স্বরূপের এক একটি রোমকূপের মধ্যে এক সেকেন্ডের মধ্যে বিলুপ্ত করে নেবেন। সকল পরম মহাব্রহ্মাণ্ড গুলিকে (universe) ব্যক্ত থেকে অব্যক্তে বদল করে, আর অসীমের ভূতনাথ হয়ে সকল তিন তত্ত্বের আত্মাদেরকে মুক্তি দিয়ে নিজের মধ্যে মিলিয়ে দেবেন। কেননা এখন পরম মহাশিবের মধ্যে পরম মহাব্রহ্মাণ্ডগুলিকে গুটিয়ে নেওয়ার শক্তি আর নেই।

যখন কিছু কমজোরি আত্মারা নিজেদের মধ্যে power না থাকার কারণে নিচের দিকে নামতে থাকে আর, তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মা যাদের মধ্যে ১০০% শক্তি ছিল তাদেরও নিচের দিকে টানতে শুরু করে তাঁদের সঙ্কল্পের মাধ্যমে; তখন মহাশিব (Galaxy-র মালিক) আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের (Solar System)-এর শিবের দ্বারা আর শিব ব্রহ্মার সাহায্যে আমাদের ১৪ ভুবনের ব্রহ্মাণ্ডটি রচনা করান (চিত্র-১ দেখুন)। আরো কমজোরি কিছু আত্মারা নিচের দিকে পর পর নামতেই থাকে নামতেই থাকে, তাদের নেগেটিভিটির কারণে তাদের সঙ্কল্পের দ্বারা এই স্থূল ধরণী আর মনুষ্য শরীর তৈরি হয়ে গেছে। এই পৃথিবীতে সবার আগে আমদের এই ভারতবর্ষ তৈরি হয়েছিল। আমাদের এই সীমাবদ্ধ ব্রহ্মাণ্ড ওই অসীমের পরম ধামের কেন্দ্রস্থল হল। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে ১৫০ আরব আলোক বর্ষের থেকেও অনেক অনেক দূর পর্যন্ত অনন্ত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড (Solar System), মহাব্রহ্মাণ্ড (Galzxy) পরম মহা ব্রহ্মাণ্ড (Universe) নিজস্ব বৃত্তের মধ্যে ঘূর্ণায়মান আছে। এই সকল ব্রহ্মাণ্ডের শিব, মহাব্রহ্মাণ্ডের মহাশিব আর পরম মহাব্রহ্মাণ্ডের পরম মহাশিব সকলেই নিচে চলে এসেছেন। এঁদের মধ্যে ১০% হলেন আকারী মানে যাদের শরীর আকাশ তত্ত্বের আর বাকি সকলে সাকারী হয়ে গেছেন, মানে মনুষ্য শরীর ধারণ করেছেন। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের মত কোটি কোটি আরত আরত ব্রহ্মাণ্ড যেগুলো কিনা ওই সকল মহাব্রহ্মাণ্ড আর পরম মহাব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আছে সেগুলি সব প্রকৃতির আবরণের মধ্যে স্থিত হয়ে আছে। (স্কন্ধ পুরাণ, পেজ নং ১৪০)।

৪. কালচক্র বা কালের গতি

সময়ের পুনরাবর্তনই হল কালচক্র। গতি বা moshan একটি অব্যক্ত তত্ত্ব। বিজ্ঞানীরাও বলেন গতি ছাড়া সংসারের কোন কাজই হয় না। এই গতিই অসীমের মহাকাল মানে অসীমের পরম পিতার দান। সমস্ত জগৎ সংসারই গতিশীল এই সম্পূর্ণ সংসার যেভাবে চলে তাকেই গতি বলে। কাল (সময়) সর্বদা গতিশীল। হৃদয়ের সাথে এটিকে যুক্ত করলে তাকে বলা হয় হৃদয়-গতি (Heart beet), ঠিক একইরকমভাবে 'নাড়ির গতি' 'রক্ত গতি', 'মনের গতি', 'বুদ্ধির গতি', 'জীবের গতি', 'পরমগতি (মৃত্যু) প্রভৃতি যদি কালের সঙ্গে যুক্ত হয় তবে তাকে কালগতি বলা হয়। এই জগৎ সংসারের প্রত্যেকটি অনু, পরমাণু, প্রত্যেকটি তারা, সূর্য, চন্দ্রমা, নক্ষত্রমণ্ডল, গ্রহ, উপগ্রহ, পৃথিবী, জল অগ্নি, বায়ু ব্রহ্মাণ্ড, মহা ব্রহ্মাণ্ড, পরম মহাব্রহ্মাণ্ড, সকল লোক-পরলোক, আর প্রত্যেকটি জীবের জীবন, গতির সঙ্গেই সংযুক্ত। শুভ কর্ম তে জীবের গতি ঊর্ধ্বে স্বর্গের দিকে আর পাপ কর্মতে গতি নিচে নরকের দিকে হয়। এই অসীমের গতিতত্ত্ব যদি না থাকত তবে সারা জগৎ প্রচেষ্টাহীন হয়ে পড়ত। সারা সংসার সংকুচিত হয়ে সলিড বা জড় পদার্থে পরিণত হ'ত। কেউ নড়তেও পারত না। পুরুষের পুরুষত্বও হল একটি গতি। কেননা কর্মগতিই সকলের গতির প্রধান কারণ। স্বভাব আর সংস্কারের বার বার পুনরাবর্তনই সময়ের পুনরাবর্তন। এই গতি যখন ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তাকে বলে 'ইচ্ছাশক্তি'। যখন জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তাকে 'জ্ঞানশক্তি' বলা হয়। কাল বা সময় সর্বদা গতিশীল। তাহলে এই গতি কোথা থেকে আসে? অসীমের power house থেকে আসে। আর এই power house কে? ওঁনারা হলেন অসীমের মহাশিব আর মহাশক্তি (হিন্দিতে বলে, বেহদ্ কে পরমপিতা অউর মাতা)।

প্রশ্বাস এর শরীরের ভিতরে আসা আর নিঃশ্বাসের শরীরের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া এটি একটি ক্রমচক্র। মানুষ দিনে মাটামুটি ২১,৬০০ বার শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়, রাতেও সেই একই। কাল এবং শ্বাস অভিন্ন, কারণ কাল প্রশ্বাসের 'অবধি' হয়ে তার সাথেই শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে। আবার নিঃশ্বাসের সাথে বাইরে বেরিয়ে আসে। এইভাবে প্রথমে দিন-রাত, তারপর ৭টি বার, তারপর দুইটি ঋতু (শুক্লপক্ষ আর কৃষ্ণপক্ষ)-র চক্র পূর্বপুরুষের আয়ু হরণ করে। তারপর ঋতুচক্র, জ্যোতিষচক্র, তারপর সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর আর কলিযুগের চক্র যা মনু-ইন্দ্র প্রভৃতিদের আয়ু হরণ করে। মনু শ্বতরূপা কালকে মন্বন্তর বলা হয়।

ব্রহ্মার ১ দিনে ১৪ মনু সমাপ্ত হয়ে যায়। তারপর ব্রহ্মার দিন রাতের চক্রকেই কল্পচক্র বলা হয়। এই কল্পচক্র ব্রহ্মার ১০০ বছরের আয়ুকে সমাপ্ত করে দেয়। ব্রহ্মার অন্তের কিছু সময় পর আবার নতুন ব্রহ্মার জন্ম হয়। এই প্রকারে সংসারের উৎপত্তি, স্থিতি আর প্রলয়ের চক্র নিরন্তর চলতেই থাকে। এটাকে কাল বা সময়ের মহাকল্পচক্র বলা হয়। জন্ম, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব আর মৃত্যুর পুনরাবর্তনই হল কালচক্র। শুভকর্মে জীব স্বর্গের দিকে আর পাপ কর্মের ফলে নরকের দিকে গমন করে। আবার একটা সময় এই লোকেই ফিরে আসে। এভাবে একটি পিঁপড়ে থেকে ব্রহ্মা পর্যন্ত পুনর্জন্মের আবর্তে আত্মারা আটকে থাকে। এই কালচক্র থেকে কেউই রেহাই পায় না। এটাই অসীমের ভগবান ভগবতীর স্বভাব-শক্তি (যোগমায়া) হয়ে অনু, পরমাণুতে

প্রকট হয়ে সমস্তজড়আর চেতন পদার্থ জীবলোক আর পরলোকের নির্মাণ করে। এটা বৈজ্ঞানিকদের অন্ধশক্তি নয়। এটি বেহদের মানে অসীমের 'মহাকাল' আর 'মহাকালির' পূর্ণ জ্ঞানসংপৃক্ত ক্রিয়া শক্তি। যা সকল জড়পদার্থ, চেতন পদার্থ আর জীবের স্বভাব স্বরূপ। যে ভাব বারবার পুনরাবৃত্তি হয় সেটাকেই বলে স্বভাব। স্বভাব কাল বা সময়ের অধীন হয়। এই স্বভাবচক্রই কালচক্র হিসাবে পরিগণিত হয়। এই স্বভাবের দ্বারাই আমাদের বায়ুমণ্ডল গঠিত হয়। আর এই বায়ুমণ্ডল থেকেই আমাদের প্রকৃতি বা শরীরের সৃষ্টি হয়েছে। এই স্বভাবচক্র (বাসনাচক্র)-ই 'কাল' অর্থাৎ সময়চক্র। এই সীমা ও অসীমের কালচক্রকে সমাপ্ত করার জন্য অসীমের পরমপিতা পরমাত্মা স্বাকার রূপ নিয়ে এই ধরনীতে বর্তমানে জন্ম নিয়েছেন। ওনাকে আপনারা দিব্যজ্ঞান যোগ স্বরূপে স্থিত হলে চিনতে পারবেন। যিনি কিনা ভূতনাথ হয়ে সমস্তজগৎসংসারকে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে অতি সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম থেকে নিরাকারী, আর নিরাকারী থেকে অসীমের পরম প্রকাশ পুঞ্জে অর্থাৎ স্বয়ম্ভুতে পরিবর্তন করবেন। এই অসীমের ভগবান-ভগবতী দিব্য দৃষ্টির দ্বারা দিব্যস্বরূপ প্রদান করে অসীমের মুক্তি আর জীবনমুক্তি দিয়ে, নিজের দিব্যযানে বসিয়ে এই মৃত্যুলোক থেকে অসীমের অমরলোকে নিয়ে যাবার জন্য স্বাকার রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনিও এসে অসীমের মাতা-পিতার সঙ্কল্পকে স্বাকার রূপ দিয়ে বা সিদ্ধ করে বিশ্ব পরিবর্তন অর্থাৎ বিশ্বকল্যাণের কার্যে ব্রতী হয়ে নিজের সৌভাগ্য তৈরী করতে পারেন। আসুন, আপনাকে স্বাগত জানাই।

কালের বিভাজন

যেমন একটি অব্যক্ত আত্মা অনেক জীবাত্মাতে বিভক্ত হয়েছে, একটি আনাদি সঙ্কল্প থেকে অনেক সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়েছে, একটি দেশ অনেকগুলি দেশে পরিণত হয়েছে এক অসীমের মহা বিরাট শরীর অনেকগুলি শরীরে বিভক্ত হয়েছে, একটি ইচ্ছা অনেকের ইচ্ছাতে পর্যবসিত হয়েছে, একটি বুদ্ধি অনেক বুদ্ধিতে ভাগ হয়েছে আর একটি মন অনেক মনে পরিবর্তিত হয়েছে, ঠিক তেমনি করে কাল অর্থাৎ সময়ও পরমাণু থেকে পরমহান পর্যন্ত অনেকগুলি কালে বিভক্ত হয়ে গেছে। আর একইভাবে একটি অসীমের মহাবিরাট স্বরূপ অনেকগুলি শরীরে পরিণত হয়েছে। বেদান্ত দর্শনে বলা হয়েছে, পরমব্রহ্মের ইচ্ছা হ'ল যে, 'আমি এক থেকে অনেক হয়ে যাই'। পরমানু হ'ল সবার থেকে সূক্ষ্ম। যার এটি অংশ তাকে পরম মহান অর্থাৎ 'পরমব্রহ্ম' বলা হয়।

সত্যযুগের আয়ু	১৭,২৮,০০০ বছর	(মানবীয় বছর-এর হিসাবে)
ত্রেতাযুগের আয়ু	১২,৯৬,০০০ বছর	,,
দ্বাপর যুগের আয়ু	৮,৬৪,০০০ বছর	,,
কলিযুগের আয়ু	৪,৩২,০০০ বছর	,,
১ চতুর্যুগ-এর আয়ু	৪৩,২০,০০০ বছর	,,

মানুষের ৩৬০ বছর = দেবতাদের ১ বছর
মানুষের ১ বছর = দেবতাদের ১ দিন
দেবতাদের বছরের হিসাবে হিসাব করলে

সত্যযুগের আয়ু	৪,৮০০ বছর
ত্রেতাযুগে আায়ু	৩,৬০০ বছর
দ্বাপর যুগের আয়ু	২,৪০০ বছর
কলি যুগের আয়ু	১,২০০ বছর
১ চতুর্যুগের মোট আয়ু	১২,০০০ বছর

সত্যযুগ

সত্যযুগে কল্পবৃক্ষ ছিল। কল্পবৃক্ষের নিচে বসে যা ইচ্ছে হত সেটা অটোমেটিক পাওয়া যেত। কল্প বৃক্ষথেকে মদিরা নির্গত হ'ত সেটা সবাই পান করে নিত। তখন পৃথিবী সতপ্রধান ছিল। সবুজে ভরা ছিল। তখন সবাই অনেক অনেক মাইল পায়ে হেঁটে যেতে পারত কারণ, আত্মায় সূক্ষ্ম শক্তি ছিল। সত্যযুগে ব্রাহ্মণ ছিল। সুখী জীবন ছিল। ইন্দ্রের রাজ্য ছিল। সবাই সোমরস পান করতেন। সুন্দর সুন্দর বাগান ছিল। আয়ুও অনেক লম্বা ছিল। পৃথ্বী রাজা ৩৫,০০০ বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। ঋষি মুনি, তপস্বী, যোগী এবং মহাত্মা পুরুষ তপস্যা করে উপরের লোকে চলে যেতেন, মহর্লোকে, যেখানে সপ্তঋষি এবং মহর্ষিগণ বাস করতেন। যাদের আয়ু ১ কল্প পর্যন্ত ছিল। আরো অধিক তপস্যা করে 'জনলোকে' চলে যেতেন। যেখানে আছেন ধ্রুব। ধ্রুব ১০০০০ বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। জনলোকে সনক প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্র আছেন। সেখানে এমন আত্মারা থাকেন যাদের শরীর নিজস্ব আলোয় আলোকিত থাকে। তারা আরো তপস্যা করে 'তপলোকে' যেতে পারতেন। যেখানে 'বৈরাগ' নামে দেবতা দাহ রহিত থাকেন, যে মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত। তাদের জীবনে সন্তাপ বলে কিছু থাকে না, তারা মুক্ত জীবনে প্রসন্নচিত্ত হয়ে থাকেন। আরো অধিক প্রচেষ্টা করলে তারা 'ব্রহ্মলোকে' চলে যান। সেখানে ওনাদের নানারকম অবস্থা আছে। যেখানে তাঁরা ব্রহ্মা সমান হবার চেষ্টা করেন। সেখানে ওনারা ব্রহ্মার থেকে ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে ব্রহ্মার সমান হয়ে যান। ব্রহ্মলোক থেকে প্রচেষ্টা করে বিষ্ণু লোক এবং তারপর আরো সাধনা করে 'শিবলোকে' যাত্রা করেন। শিবপুরি থেকে আরো প্রচেষ্টা করে নিরাকার শরীর লাভ করার পর 'পরমধাম' এ গমন করেন। সেখানে গিয়ে তারা নিরাকার বিন্দুতে পরিণত হন। সেই নিরাকার বিন্দুর আত্মাদেরও আলাদা আলাদা স্টেজ রয়েছে। যেমন 'লোমস' ঋষির আয়ু ব্রহ্মার ১৫ বছরের সমান ছিল। ১৫ বছর = ৫৪০০০ কল্প। ১ কল্পের (দিন + রাত) পৃথিবীর মানুষের বছরের হিসাবে

৮,৬৪,০০,০০,০০০ বছর (৮৬৪ কোটি)। মারকন্ডে ঋষির আয়ু ব্রহ্মার ৭ দিনের সমান ছিল। ৭ দিন = ৭,০০০ চতুর্যুগ, ১ চতুর্যুগ = ৪৩,২০,০০০ বছর। যদি তাঁরা উপর থেকে নিচের লোকগুলির বাসিন্দাদের দেখার ইচ্ছা করেন তো দেখতে পারেন। আর যদি তাদের সাথে সঙ্কল্প দ্বারা কথা বলতে চান তো বলতে পারেন। যদি তারা তপস্যা বা প্রচেষ্টা করেন তো উপরের লোকে গমন করতে পারেন। যদি উপরের লোকেরা নিজের মর্জিতে নিচের লোকগুলির বাসিন্দাদের উপরের লোকে ডাকতে চান তো ডাকতে পারেন। আর কথা বলতে পারেন। উপরের লোকরা নিজের মর্জির নিজেই মালিক। উপরের লোকগুলিতেও জ্ঞানের কেন্দ্র বা জ্ঞানাশ্রম আছে। ওই জ্ঞান কেন্দ্রগুলিতে তপস্বী, মুনি, মহাজ্ঞানী, সিদ্ধগুরুদের বাস। শরীর ছাড়ার পর, যারা মৃত্যুলোকে বেদ শাস্ত্র অধ্যায়ন আর আধ্যাত্মিক বিকাশ করেছেন, এই রকম ব্যক্তিদের উপরের লোকের জ্ঞানকেন্দ্র থেকে আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য জ্ঞানপ্রদান করা হয়। এই সব লোকে বৈচারিক ক্রিয়ার মাধ্যমেই জ্ঞান দেওয়া হয়। সেটা এক মুহূর্তেই আত্মসাৎ হয়ে যায়। কেননা তিন তত্ত্বওয়ালা আত্মার ভিতর দিব্য দৃষ্টি এসে যায়। যারা এই মৃত্যুলোকে ব্রহ্মাণ্ড আর পরম তত্ত্বের জ্ঞান নিয়েছেন, যত বেশি মনযোগসহকারে এই জ্ঞান নিয়েছেন, উপরেও তিনি খুব তাড়াতাড়ি ওই জ্ঞান বুঝে যান। কারণ তিন তত্ত্বের আত্মারা দিব্য দৃষ্টি দিয়েই সেই জ্ঞান আহরণ করেন। আর তারা উপরের দিকের লোকগুলিতে গিয়ে সুখী জীবনযাপন করেন। তারপর সত্য লোক থেকে বিষ্ণু লোকে, বিষ্ণু লোক থেকে শিবলোকে আর শিবলোক থেকে পরমধামে নিরাকারী রূপে বিন্দু স্বরূপ হয়ে যান। ওখানেও আত্মারা আলাদা আলাদা পর্যায়ে থাকেন। তারা যদি চান তো পৃথিবীতে এসে আবার জন্ম নিতে পারেন।

ত্রেতা যুগ

ত্রেতাযুগে নানাপ্রকার ফুল ও ফল এমনি এমনিই ফলে থাকত। যেখানে ক্ষত্রিয় বর্ণ হত। যেখানে আত্মায় সূক্ষ্ম পাওয়ার ছিল। পায়ে হেঁটে চলা হত। রামের জন্ম ত্রেতা যুগের অন্তিম কালে হয়েছিল। শ্রীরাম ১১ হাজার বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। সেখানে ফল-মূল-আদি খাওয়ার প্রচলন ছিল। এই সময়ও ঋষি, মুনি, তপস্বী, যোগীগণ তপস্যা করে উপরের লোকে চলে যেতেন। আত্মা যখন যোগী হয় তখন উর্দ্ধগতি নিয়ে উপরের লোকগুলিতে গমন করে আর যখন ভোগী হয় তখন নিচে পাতাল আর নরকের দিকে ধাবিত হয়। আর দুঃখ ভোগ করে। বেদাদী শাস্ত্রগুলিতে বর্ণিত যজ্ঞ, দান, জপ, হবন, হোম, তীর্থ ব্রত, মঠ সমুদয় বা অন্যান্য সামগ্রীর দ্বারা সাতলোক সাধ্য হয়। ত্রেতার শেষ ভাগ আর দ্বাপর এর প্রথম দিকে রামের সময়কালীন ১৪ রকম আনাজ, ধান, যব প্রভৃতি মাটিতে ঢেলে দেওয়া হত আর সেটা নিজে নিজেই ফলন হয়ে যেত। সুখী জীবন ছিল। রাম ছিলেন অসীম ধামের পরমপিতা অর্থাৎ অলমাইটি অথরিটির অবতার।

দ্বাপর যুগ

দ্বাপর যুগে পরিশ্রম করে আনাজ উৎপাদন করতে হত। এখানে বৈশ্য বর্ণ হত। এখানে চাষ করতে হ'ত। হাল চালাতে হ'ত, তবুও সুখী জীবন ছিল। দ্বাপর যুগের অন্তিম সময়ে কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল। রাম এবং কৃষ্ণ দুজনই অলমাইটি অথরিটি অর্থাৎ পরম পিতার অবতার ছিলেন। রাম এবং কৃষ্ণের জন্মের মধ্যে ৮ লাখ ৬৯ বছরের ফারাক ছিল। সকল ধর্ম পিতা আর ধর্মগুরু নিরাকার ভগবানকে মানেন। দেবদূত স্বরূপের মান্য করেন। তাঁরা সকলেই নিজ নিজ ধর্মের স্থাপনা তিন তত্ত্বওয়ালা আত্মাদের দ্বারা করাচ্ছেন। মহাত্মা বুদ্ধ অহিংসাকে পরম ধর্মবলে জ্ঞান দিয়েছেন। মুসলিম ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেরাও আদম-হবাকে আর ফরিস্তাকে মানেন। খুদা বা নুর অর্থাৎ পরম আলোককে মানেন। যীশুখ্রীষ্ট বলেছিলেন যে আমি পরমাত্মা বা পরমপিতার দূত, 'I am the messenger of God and God is lighty. উনিও নিরাকার এবং দেবদূত বা Angel কে মানতেন। শঙ্করাচার্য ও নিরাকারকে মানেন। মুহম্মদ বলেছেন, ক্যায়ামতের দিনে আল্লা তালা নুর (আলোক) স্বরূপে ধরনীতে এসে কবর থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবেন। হয় দেবদূত বানাবেন আর নয়তো শয়তান বানাবেন। এখন ক্যায়ামতের দিন চলছে। উনিও নিরাকার, ফরিস্তা (দেবদূত) আর জন্নত (স্বর্গ)কে মানেন। ইব্রাহিম ও বলেছিলেন যে, আদমকে খোদা বোলো না, আদম খোদা নন, কিন্তু খোদার নুর থেকে আলাদা নন। তিনিও নিরাকারকে আর দেবী-দেবতা বা ফরিস্তাকেও মানেন। গুরু নানক দেব এবং অন্যান্য গুরুরাও 'কালের' চিন্তন করেছিলেন। যখন অকাল-এর আসন স্থাপিত হল তারা অকাল পুরুষকে মানলেন। স্বামী নারায়ণ 'স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়'-এর স্থাপনা করেছেন। এঁরা সবাই উপরে তিনতত্ত্বে বিরাজমান আছেন। এঁরা সবাই নিজ নিজ ধর্মের স্থাপনা করে উপর থেকে নিজ নিজ বংশাবলী (Dynasty) কে বাড়িয়ে চলেছেন। এঁদের সবার জন্ম আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে হয়েছে। ওনারা সবাই যেখান থেকে এসেছিলেন সেই লোক পর্যন্ত গিয়ে, নিজ নিজ রচয়িতার মধ্যে প্রবেশ করে এই ব্রহ্মাণ্ডের পরমধাম পর্যন্ত যাবেন।

কলিযুগ

কলিযুগে প্রচুর পরিশ্রম করে অর্থ রোজগার করতে হয়। কলিযুগে হয় শুদ্রবর্ণ। প্রথমদিকে এতটা দুঃখ ছিল না যতটা অতিরিক্ত পরিমাণ এখন আছে। শূদ্রের রাজত্ব চলে। ব্রাহ্মণ শুদ্রের মত আর শুদ্র ব্রাহ্মণের মত কর্ম করে। চারিদিকে পাপাচার হয়। বিষ্ণুর ২৮ অবতার যুগে যুগে অবতীর্ণ হতে থাকেন। কিন্তু সৃষ্টির পরিবর্তনের জ্ঞান ওনার নেই।

৫. প্রলয়—মহাপ্রলয়

প্রলয় ছয় প্রকারের হয়। (১) নিত্য প্রলয়, (২) আংশিক বা অর্ধ প্রলয়, (৩) মনবন্তর প্রলয়, (৪) কল্প, নৈমত্তিক বা ব্রহ্ম প্রলয়, (৫) মহা কল্পপ্রলয় এবং (৬) মোক্ষ প্রাপ্তি অত্যান্তিক প্রলয়।

(১) **নিত্য প্রলয় ঃ** নিত্য প্রলয় সকল সময় সূক্ষ্মের মধ্যে হতেই থাকে। নিদ্রা অবস্থা ও এক প্রকার প্রলয়ই। জন্ম আর মৃত্যু এটাও প্রাণীদের একপ্রকার প্রলয়। সঙ্কল্প থেকে নিচে নেমে যাওয়াও একটি প্রলয়।

(২) **আংশিক বা অর্ধপ্রলয় ঃ** এই প্রলয় প্রত্যেকটি চতুর্যুগ পার হলে একবার হয়। অর্ধ প্রলয় হলে পৃথিবীতে জলে ভরে যায়। লোকেরা পাহাড়-এর উপর উঠে যায়। সিদ্ধ পুরুষদের আগে থেকেই অনুমান হয়ে যায়, সেই ঋষিমুনিরা উপরের দিকের লোকগুলিতে চলে যান। চার যুগ পূর্ণ হলে মুসলধারে বৃষ্টি হয়ে ধরণী জলে ভরে যায়। বিষ্ণু নানা অবতার নিয়ে পৃথিবীতে আসেন।

(৩) **মন্বন্তর প্রলয় ঃ** যখন ৬ = ৭১.৪২ প্রত্যেক চতুর্যুগের পর একটি করে জলপ্রলয় হয়। পুরো পৃথিবী জলমগ্ন হয়ে যায় আর মনু-শতরূপার আয়ু শেষ হয়ে যায়। একে ১ মন্বন্তর বলা হয়। যখন ধরণী জলের তলায় চলে যায় তখন বিষ্ণু মৎস্য অবতারের রূপ ধরে ইন্দ্র, দেবগণ, সপ্তর্ষি, মনুআদী বীজগুলিকে বাঁচিয়ে নৌকায় বসিয়ে নিয়ে যান। এক একটি মন্বন্তরের সাথে সাথে ইন্দ্র, ঋষি, দেবর্ষি, দেবতা আর পিতৃগণের পরিবর্তন হয়ে যায় (পরলোক আর পুনর্জন্ম'—নতুন এর পেজ নং ২৩৯ আর পুরানোর ২১৯)। এক মনু শতরূপার আয়ুষ্কাল = ৭১.৪২ চতুর্যুগ। ১ চতুর্যুগ × ৭১.৪২ = ১ মন্বন্তর। ৪৩,২০,০০০ × ৭১.৪২ = ৩০,৮৫,৩৪,৪০০ বছর এ ১ মন্বন্তর পূর্ণ হয় তখন বিষ্ণু ব্রহ্মার দ্বারা দ্বিতীয় সপ্তঋষির সৃষ্টি করান। তারপর সেই সপ্তঋষি আবার অন্য মনু শতরূপার রচনা করেন। মনু শতরূপা প্রজাপতির রচনা করেন আর প্রজাপতি দেবী-দেবতাদের সৃষ্টি করেন। এই প্রকার আবার বংশবিস্তার হতে থাকে। মনু ৪টি বর্ণ তৈরি করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শুদ্র। মানুষের কর্ম অনুযায়ী তাদের 'বর্ণ' দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণগণ পূজা অর্চনা, ক্ষত্রিয়গণ রাজ্য শাসন ও যুদ্ধ, বৈশ্যগণ ব্যবসা আর শুদ্রগণ এই তিন বর্ণের সেবা করেন। 'মার্কণ্ড' পুরাণ অনুযায়ী কালের চক্রে মনুর সাথে দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত পদাধিকারীগণ বদল হয়ে যান। এইভাবে ১৪টি মনু শতরূপার যুগ বা আয়ু শেষ হলে ১৪টি মনন্বন্তর পূর্ণ হয়ে যায়। আর এক একটি মন্বন্তরের পর আসে মন্বন্তর প্রলয়।

(৪) **কল্প প্রলয় বা নৈমত্তিক বা ব্রহ্ম প্রলয় ঃ** ১০০০ চতুর্যুগ নিয়ে হয় ব্রহ্মার ১ দিন। একে ১ কল্প বলে। ব্রহ্মার ১ দিনে বা ১০০০ চতুর্যুগে ১৪টি মনু-শতরূপার জন্ম এবং মৃত্যু হয়। অর্থাৎ ১৪টি মন্বন্তর = ১৪ মনুশতরূপার আয়ুষ্কাল = ব্রহ্মার ১ দিন = ১ কল্প। ৪৩,২০,০০০ × ১০০০ = ৪,৩২,০০,০০,০০০ = ব্রহ্মার ১ দিন বা কল্প = ১৪ মনুশতরূপার আয়ুষ্কাল = চারশো বত্রিশ কোটি বছর। ব্রহ্মার ১ দিন চলে গেলে পৃথিবী ক্ষীণ বা কমজোরি হয়ে যায়। সেই সময় ১০০ বছর পর্যন্ত অনাবৃষ্টি বা খরা হয়। অকাল পড়াতে ১০০ বছরে কমজোরি পাপি আত্মারা ক্ষিদে তৃষ্ণায় কষ্ট পেয়ে মরে যায়। তখন বিষ্ণু এই সংসারের বিনাশ করার জন্য

নিজের মধ্যে লীন করার চেষ্টা করেন। তখন তিনি সূর্যের ১২টি কিরণে স্থিত হয়ে ধরণীর সকল জলকে শুকিয়ে দেন। পৃথিবী শুষ্ক হয়ে যায়। ১২টি সূর্যের সমান তাপ সমস্ত সমুদ্র নদীনালা, ঝর্ণা, সরোবর প্রভৃতিকে একেবারে শুষে নেয়। পাতালের জল ও শুকিয়ে যায়। বিষ্ণুর প্রভাবে সূর্যের তাপ ১২টি সূর্যের সমান হয়ে যায় আর তা তিনটি লোক (ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্গলোক) কেই জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়। পৃথিবী কচ্ছপের পিঠের মত দেখতে হয়ে যায় আর বৃক্ষসকল জ্বলে যায়। তারপর শিব রুদ্ররূপ ধারণ করে কালাগ্নি বর্ষণ করেন। সম্পূর্ণ চরাচর নষ্ট হয়ে যাবার পর ওই আগুনের ঝলকা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ৭টি পাতালকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে চতুর্দিকে ঘুরপাক খেতে থাকে। ত্রিলোকের যত জলাধার আছে সব নষ্ট হয়ে একটি গরম কড়াই-এর মত হয়ে যায়। জঙ্গল, গাছপালা শুকিয়ে কাঠ হয়ে ছাই হয়ে যায় আর সূর্য বড় হয়ে পৃথিবী সমেত তিনটি লোককেই গ্রাস করে। বাঁচার আর পরিস্থিতি না থাকার দরুন জ্ঞানী এবং মহান আত্মারা মহর্লোকের দিকে যাত্রা করেন যেখানে সপ্তঋষিগণ বাস করেন। এই বিশাল তাপরশ্মি মহোর্লোক পর্যন্তও পৌঁছে যায়। তখন ঋষি, মুনি, সন্ত, মহাত্মা, সাধু, মহর্ষি ও সপ্তর্ষিগণ 'জনলোকে' চলে যান। সেখান থেকে আবার জ্ঞান পেতে পেতে মহাত্মারা আরো উপরের দিকে গমন করতে থাকেন এবং সর্বশেষে শিবপুরীর পরমধামে নিরাকারী বিন্দুসম হয়ে বিরাজ করেন। তখন সম্পূর্ণ জগৎ নষ্ট করার জন্য রুদ্ররূপধারী নিজের নিঃশ্বাস বায়ু দিয়ে বিশালাকায় বাদল বা মেঘ উৎপন্ন করেন। এই বাদল প্রবল বিদ্যুতের ঝলকানি আর গর্জন দিয়ে প্রচুর পরিমাণে জল বর্ষণ করতে থাকে। সেই বৃষ্টি ১০০ বছর ধরে হয় আর তাতে সমস্ত আগুন নিভে গিয়ে সারা পৃথিবী জলমগ্ন হয়ে এক মহা সাগরে পরিণত হয়। স্বর্গ, মর্ত, পাতাল এই তিনটি লোকের সকল জড় আর চেতন পদার্থের বিনাশ হয়ে যায়। জল তিনটি লোককে ছাপিয়ে সপ্তঋষিদের স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সম্পূর্ণ চরাচর তখন সূর্যের অভাবে অন্ধকার হয়ে যায়, বিন্দুমাত্র অগ্নিও আর কোথাও বাকি থাকে না। এরপর বিষ্ণু তাঁর নিঃশ্বাস বায়ু প্রক্ষেপন করে মেঘগুলিকে দূরে সরিয়ে দেন। সেই বায়ু ১০০ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে আর জলের সূক্ষ্মকণা ও পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। তখন আকাশে শুধু শুদ্ধ বায়ুই রয়ে যায়। বিষ্ণু সেই বায়ু সেবন করে জলের মধ্যে শেষনাগের শয্যায় শুয়ে শুয়ে যোগনিদ্রায় নিজের স্বরূপের চিন্তা করতে থাকেন। তখন সূক্ষ্ম বায়ুও শেষ হয়ে যায় শুধু পড়ে থাকে শুদ্ধরূপ আকাশ। জনলোকের কিছু সনক প্রভৃতি বেঁচে যাওয়া মহান আত্মা ও ব্রহ্মালোকবাসীগণ বিষ্ণুর চিন্তন করতে থাকেন। বিষ্ণুর কল্প প্রলয় করতে করতে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু দুজনেরই রাত্রি হয়। এই কল্প প্রলয়ের নিমিত্ত হন বিষ্ণু তাই একে নৈমিত্তিক প্রলয়ও বলা হয়। যতক্ষণ ব্রহ্মার দিন ততটাই ব্রহ্মার রাত্রি হয়। আর তখন সারা সংসার বিষ্ণুতে বিলীন হয়ে যায়।

১০০০ চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিন হয়। রাত্রিটাও হয় ততটাই। ব্রহ্মার একদিন বা এক কল্প = ৪,৩২,০০,০০,০০০ বছর (৪ আরব ৩২ কোটি মানুষের বছর)। ব্রহ্মার দিন এবং রাত মিলিয়ে হয় = ৪,৩২,০০,০০,০০০ × ২ = ৮ আরব ৬৪ কোটি বছর।

$$\text{ব্রহ্মার ১ সেকেন্ড} \div \frac{\text{ব্রহ্মার ১ অহোরাত্রির আয়ুর সময়}}{\text{ব্রহ্মার ১ দিন + ১ রাত (২৪ ঘণ্টা)}} \div \frac{\text{৮,৬৪,০০,০০,০০০ বছর}}{\text{২৪×৬০×৬০ (২৪ ঘণ্টার সেকেন্ড বানালে)}} \div \frac{\text{৮ আরব ৬৪ কোটি বছর}}{\text{৮৬,৪০০ সেকেন্ড}} = \text{১ লাখ বছর}$$

ব্রহ্মার ১ সেকেন্ড = পৃথিবীর ১ লাখ বছর হয়। যখন এই সীমার মধ্যে আবদ্ধ ব্রহ্মা এক সেকেন্ডর সাক্ষাৎকারের জন্য উপরে টেনে নেন তখন একটি মানুষের আয়ু ১ লাখ বছর বেড়ে যায়, তাহলে অসীমের মাতা-পিতার উপর যখন আমাদের ১০০% দৃঢ়তা চলে আসে আর ১ সেকেন্ডর জন্য তাঁদের কৃপাদৃষ্টি প্রাপ্ত হয়, তখনই আমরা জীবনমুক্তি পেয়ে অমরত্ব লাভ করি এবং দিব্যলোকে গমন করি। বিষ্ণু যখন জাগেন তখন আবার ব্রহ্মার দ্বারা সকল সৃষ্টির রচনা করান।

ব্রহ্মার ১ মাস = ৮,৬৪,০০,০০,০০০ × ৩০ দিন = ২,৫৯,২০,০০,০০,০০০ বছর মানে, ২ খরব ৫৯ আরব ২০ কোটি মানবীয় বছর।

ব্রহ্মার ১ বছর = ২,৫৯,২০,০০,০০,০০০ × ১২ মাস = ৩১,১০,৪০,০০,০০,০০০ বছর = ৩১ খরব ১০ আরব ৪০ কোটি বছর।

ব্রহ্মার প্রথমার্ধ (মধ্যবয়স) = ৫০ বছর = ৩১,১০,৪০,০০,০০,০০০ × ৫০ = ১৫,৫৫,২০,০০,০০,০০,০০০ মানে, ১৫ নীল ৫৫ খরব ২০ আরব মানবীয় বর্ষ।

ব্রহ্মার আয়ুর ৫০ বছর কালকে বলে প্রথমার্ধ আর পরের ৫০ বছর কালকে বলে পরার্ধ। পরার্ধ কে 'পর' ও বলা চলে। ব্রহ্মার ১০০ বছর সময়কে দুই পরার্ধ বা মহাকল্পও বলা হয়। ব্রহ্মার ১০০ বছর সময় মানে, ১ বছর = ৩৬০ দিন × ১০০ = ৩৬,০০০ দিন বা কল্প (ব্রহ্মার হিসাবে)। ব্রহ্মার ১ বছর = মানুষের ৩১ খরব ১০ আরব ৪০ কোটি বছর। সুতরাং ব্রহ্মার ১০০ বছর = ৩১,১০,৪০,০০,০০,০০০ × ১০০ = ৩১,১০,৪০,০০,০০,০০,০০০ মানবীয় বর্ষ (৩১ নীল ১০ খরব ৪০ আরব বছর)।

এই বর্তমান সময়ে ব্রহ্মার প্রথম অর্ধের ৫০ বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয়ার্ধের বা পরার্ধের প্রথম দিন চলছে। ব্রহ্মার আয়ুর হিসাবে এই সময় মানুষের ১৫,৫৫,২১,৯৭,২৯,৪৯,০৭৪ বছর পার হয়ে গেছে। এর থেকে প্রথম অর্ধেক সময়কে বাদ দিলে,

১৫,৫৫,২১,৯৭,২৯,৪৯,০৭৪
– ১৫,৫৫,২০,০০,০০,০০,০০০
————————————
= ১,৯৭,২৯,৪৯,০৭৪

এখন দ্বিতীয় অর্ধের প্রথম দিনের ১,৯৭,২৯,৪৯,০৭৪ মানবীয় বছর পার হয়ে গেছে। উপরের সময়কে মন্বন্তর বের করার জন্য জন্য তার নিচে ১ মনুর আয়ুষ্কাল দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। ১,৯৭,২৯,৪৯,০৭৪ ÷ ৩০,৮৫,৩৪,৪০০ বছর বা ১ মন্বন্তর কাল বা ১ মনু-শতরূপার আয়ুষ্কাল। ১ মনুর আয়ুষ্কালের সাথে ভাগ করলে, ৬ মন্বন্তর আর ১২,২৭,৪২,৬৭৪ বছর সময় শেষ হয়ে গেছে। তার মানে ৭ নম্বর মন্বন্তরেরও ১২,২৭,৪২,৬৭৪ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। উপরের ৭টি মন্বন্তরের সময়কে চতুর্যুগ বানানোর জন্য নিচে তাকে ১ চতুর্যুগ দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। ৬ মনন্বন্তর আর ১২,২৭,৪২,৬৭৪ ÷ ৪৩,২০,০০০ অর্থাৎ ১ চতুর্যুগ দিয়ে ভাগ করলে = ২৮ চতুর্যুগ আর ৭,৮২,৬৭৪ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। মানে বর্তমান সময়ে ৭ম মনন্বন্তর চলছে। এরপর কোনো মনু আর ব্রহ্মা আসবে না। এটা সর্বশেষ ব্রহ্মার ৬ মন্বন্তর মানে ২৮ চতুর্যুগ আর ৭ লাখ ৮২ হাজার ৬৭৪ বছর ব্যতিত হবার পর এখন অসীমের মাতা-পিতা সাকাররূপে সারা বিশ্ব সংসারকে ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত বানিয়ে অসীমের পরমধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই ধরণীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। এটা ব্রহ্মার ২ পরার্ধের সময়, ব্রহ্মার আয়ুর শেষ সময়। এই দ্বিতীয় অর্ধের সময়টা বিষ্ণুর শাসনের অধীন নয়। এইভাবে কাল পরমাণু থেকে ব্রহ্মা পর্যন্ত বিভাজিত আছে। এটা ক্ষর (অর্থাৎ যার ক্ষয় বা বিনাশ হয়) ব্রহ্মার বিভাজনের সময়। এটা সময়ের ব্যক্ত রূপ এরপর আসবেন অসীমের পরম ব্রহ্মা যাঁর কোনদিন বিনাশ হয়না। উনিই সকল কারণের কারণ 'অসীমের অক্ষয় ব্রহ্মা'। সীমাবদ্ধ ব্রহ্মালোক পর্যন্ত যতলোক আছে সকলই নশ্বর। তাই ব্রহ্মার আয়ুকেও ক্ষীণ করে।

লোমস ঋষির আয়ু ব্রহ্মার ১৫ বছর অর্থাৎ ব্রহ্মার ৫৪০০ দিন ছিল। ব্রহ্মার ১ দিন + ১ রাত (অহোরাত্রি) = ৮,৬৪,০০,০০,০০০ মানবীয় বর্ষ। মার্কন্ড ঋষির বয়স ব্রহ্মার ৭দিনের সমান ছিল। অর্থাৎ ৮৬৪,০০,০০,০০০ × ৭ = ৬০,৪৮,০০,০০,০০০ বছর। ব্রহ্মলোকের বাসীগণ ব্রহ্মার সাথেই বিলুপ্ত হয়ে যান।

- মানুষের ১ বছর = দেবতার ১ দিন
- দেবতাদের ১ বছর = সপ্তঋষিদের ১ দিন
- সপ্তঋষিদের ১ বছর = ধ্রুব-এর ১ দিন
- ধ্রুবের ১ বছর = মহর্লোকের ১ দিন
- দেবতাদের ১ বছর = মানুষের ৩৬০ বছর
- এখানকার ১ বছর = ইন্দ্রপুরীর ১ দিন
- এখানকার ১ মাস = চন্দ্রলোকের ১ দিন

- এখানকার ১ বছর = চন্দ্রলোকের ১ মাস
- ব্রহ্মার ১ সেকেন্ড = পৃথিবীর ১ লাখ বছর
- ব্রহ্মার মহাকল্প (১) = মহাবিষ্ণুর ১ সেকেন্ড
- ব্রহ্মার ১ মহাকল্প = ৩৬,০০০ কল্প
- ব্রহ্মার ২ পরার্ধ = ব্রহ্মার ১০০ বছর

(৫) ব্রহ্মার ১০০ বছরের প্রকৃত প্রলয় বা মহাকল্প প্রলয় ঃ

প্রত্যেক ব্রহ্মার ১ দিন বা কল্পে ১৪ মনু-শতরূপার আয়ু পার হয়ে যায়। এভাবে দিন রাত চলতে চলতে যখন ব্রহ্মার ৩৬,০০০ তম কল্পের ১৪তম মনুর সময় পূর্ণ হয়ে আসে তখন মহা কল্পের ও শেষ সময় এসে যায়। তখন ব্রহ্মার ১০০ বছরের জীবন পূর্ণ হয়ে যায়।

তখন শিব দেখেন যে ব্রহ্মাণ্ডতে আর পাওয়ার বা শক্তি নেই। যখন মহাশিব শিবের দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড বানিয়েছিলেন তখন শিবের মধ্যে শিবত্ব বা Positive power ছিল। সেই power দিয়ে ব্রহ্মাণ্ড গঠিত হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি ক্ষীণ হতে থাকে। তখন শিব নিজের শক্তিকে একত্রিত করার জন্য রুদ্র রূপ ধারণ করেন আর উপর থেকে কালাগ্নি বর্ষণ করে ব্রহ্মাণ্ডের power কে আবার নিজের ভেতর প্রবেশ করিয়ে নিতে চান। তখন তিনি মহাকল্পের মহাপ্রলয় ঘটান। সৃষ্টি থেকে সমস্ত ব্যক্ত বা পঞ্চতত্ত্বের অব্যক্ত প্রকৃতিতে বিলীন হওয়াকেই মহাকল্পপ্রলয় বলা হয়। এই সময় অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতির দ্বারা সমস্ত বিশ্বচরাচর, স্বর্গ, মর্ত, পাতাল, সকল প্রাণী এবং সকল লোক ধ্বংস হয়ে যায়। এই মহা কল্প প্রলয়ের সময় বিষ্ণুর ইচ্ছাতে মহাতত্ত্ব সমেত সমস্ত বিকার এবং আত্মারও বিনাশ হয়ে যায়। প্রথমে ভূমি ও তার গন্ধকে জল দ্বারা শোধন করা হয়। পৃথিবী লয় হয়ে তখন একটি মহাসাগরে পরিণত হয়। জল তীব্রবেগে এবং বিশাল গর্জন করে সমস্ত জগৎ সংসারের দিকে তেড়ে আসে।

জল সমস্ত জগৎব্যাপী ছড়িয়ে যায়। কোথাও স্থির থাকে আবার কোথাও প্রবল বেগে বইতে থাকে। এরপর যখন রুদ্র রূপ ধারী শিব কালাগ্নি বর্ষণ করেন তখন জলের গুণ ওই অগ্নির তেজে বিলীন হয়ে যায়। সূক্ষ্ম জল বা বাষ্পকেও অগ্নি শুকিয়ে দেয়। জল শুকিয়ে যাবার পর উপর নিচ চারিদিকে অগ্ন্যুৎপাত হতে থাকে। তারপর অগ্নি আস্তে আস্তে বায়ুর দ্বারা শীতল হয়ে তার সামান্য তেজও হারিয়ে ফেলে। বায়ু উপর নীচ সবদিকে প্রবলভাবে চলতে থাকে আর জগৎ-এ অন্ধকার নেমে আসে। বায়ুর দ্বারা অগ্নিতত্ত্ব শান্ত হয়ে যাবার পর বায়ুকেও আকাশ টেনে নেয়। আর শুধু শুদ্ধ আকাশই পরে থাকে। তখন রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ কিছুই আর বাকি থাকে না। শুধুমাত্র পরম মহা আকাশই থাকে। তারপর আবার বায়ু তেজ গতি নিয়ে প্রবলভাবে চলতে থাকে এবং আকাশ-এর বৃদ্ধি হতে থাকে। আকাশ অন্ধকার তত্ত্ব আর অন্ধকার মহতত্ত্বে বিলীন হয়ে যায়। আর মহতত্ত্বকেও মূল প্রকৃতি নিজের মধ্যে লীন করে নেয়। তখন প্রকৃতির ব্যক্ত স্বরূপ অব্যক্ত স্বরূপে

পরিণত হয়। পুরুষ যে কিনা সকলের অন্তরাত্মা সে প্রকৃতিকে নিজের মধ্যে ধারণ করে লুপ্ত করে নেয়। পুরুষ আর প্রকৃতি এক হয়ে যায়।

মহাভারতে লেখা আছে যখন গরুড় ইন্দ্রলোকে অমৃত নেবার জন্য গেছিলেন তখন তাকে একটি একটি করে প্রত্যেকটি তত্ত্বের আবরণকে পার হতে হয়েছে। পৃথিবীতে পাঁচটি তত্ত্বই রয়েছে কিন্তু ভূমি তত্ত্বের বিশেষত্ব থাকার দরুণ নাম হয়েছে ভূলোক। এর উপরে ঘিরে আছে চারটি তত্ত্ব কিন্তু সেখানে জলতত্ত্বের বিশেষত্ব বেশি। তার আগে একটি বিস্তৃত কুয়াসা বা মেঘের মত অংশ পার হতে হয়। তার পরে আছে তিন তত্ত্বের আবরণ যাতে অগ্নি তত্ত্বের বিশেষত্ব বেশি থাকে। এরপর আছে দুই তত্ত্বওয়ালা বৃত্ত যেখানে বায়ু তত্ত্বের বিশেষত্ব বেশি আছে। তারপর আছে শুদ্ধ আকাশতত্ত্বের বৃত্ত যেখানে অন্য কোনো তত্ত্ব থাকে না। এই বৃত্তের পর আছে অন্ধকারের আবরণ। আর তার পরেই আছে জ্ঞানের আবরণ। পরম ধামকে ছেড়ে যতগুলি লোক আছে সেই লোক পর্যন্ত যেসব আত্মারা পৌঁছায়, তাদের পুণ্যের হিসাব শেষ হয়ে গেলে আবার এই মৃত্যুলোকে আগমন করতে হয়। কারণ ঐ সকল লোক কোন না কোন তত্ত্বের আবর্ত্তের মধ্যে থাকে। এইসব লোকের আত্মার শরীর এই সকল তত্ত্ব দিয়েই তৈরি হয়। আর কোন না কোন তত্ত্বের শরীর থাকার দরুণ তারা তাদের পুণ্য ভোগ করতে পারেন। আর সেই কারণেই অসীমের মাতা-পিতাকে চিনে নিয়ে, তাদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে, তাঁদের থেকে দিব্য জ্ঞান যোগ শিক্ষা করে, এই পাঁচ তত্ত্বের উপর, সূর্য চন্দ্র, তারা সকল পার করে ১৫০ আরব প্রকাশ বর্ষও পার করে ৮.৪ কলা যা পৃথিবী থেকে ৬১,১৪,৪০০ আরব প্রকাশ বর্ষ দূরে আছে সেখানে নিজের এই শরীরকে কল্পনায় নিয়ে যেতে হবে। একই বস্ত্র একই শরীর কিন্তু সেটা সোনালী আলোর মত, আর তার থেকে পরম লাইটের প্রকাশ হচ্ছে। আত্মা আর শরীর দুটোই আলোর তৈরি সেই হিসাবে নিজে অনুভব করতে হবে। আর এইভাবে নিজেকে দিব্য অলৌকিক স্বরূপে দেখতে দেখতে পরম পিতার পরম প্রকাশে সমাধিস্থ হয়ে সেই অবস্থায় বিশ্ব কল্যাণার্থে সঙ্কল্প করতে হবে যে, এই সৃষ্টির আসে পাসে যত প্রাণী, আত্মা, পশুপাখি, জীবজন্তু, গাছপালা প্রভৃতি যা কিছু আছে তাদের সবার চিরকল্যাণ হোক। সবার চিরদিনের জন্য মঙ্গল হোক, চিরদিনের জন্য ভালো হোক আর সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হোক। সবাই প্রেম আর স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হোক আর মিলে মিশে থাকুক। এমন সঙ্কল্প করতে করতে নিঃসঙ্কল্প রূপ ধারণ করতে হবে। যাতে আমাদের এই সঙ্কল্প অগুন্তিবার সারা সৃষ্টিতে প্রসারিত হতে থাকে। এই প্রকারে যে সকল গুণ অসীমের পরম পিতার মধ্যে আছে সেই সকল শক্তি সন্তানদের মধ্যে প্রসারিত হবে। তখন সাধারণ মনুষ্য আত্মা যোগী এবং জ্ঞানী হয়ে মানুষ থেকে দেবতায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে। বর্তমানে আমাদের অসীমের পরম পিতা সীমাহীন মহাকালস্বরূপ দিব্য মহাপুরুষ সাকারি রূপে তাঁর সৃষ্টি অসীমের পরম আত্মা সন্তানদের উদ্ধার করে স্থানে, অসীমের পরম শান্তি ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন; এই বিশ্বের কল্যাণ করার জন্য আর পৃথিবীর চরম দুর্দশা দূর করার নিমিত্তে যাদের তিনি পাঠিয়েছিলেন এই ধরনীতে অনেক যুগ আগে।

এখন চিত্র নং-১ দেখুন। এই চিত্রে ১৪ ভুবনের একটি ছোটো ব্রহ্মাণ্ড দেখানো হয়েছে। এতে ৭টি লোক

পৃথিবীর উপরে আর ৭টি লোক পৃথিবীর নিচের দিকে দেখানো হয়েছে। প্রত্যেকের সাইজও দেওয়া হয়েছে। এই ব্রহ্মাণ্ড উচ্চতায় ৬০ কোটি যোজন আর প্রস্থে ৫০ কোটি যোজন বিস্তৃত। এটি একটি ডিমের আকার যুক্ত। এই ১৪ ভুবনের মধ্যে সবার আগে আছে ১ কোটি যোজন পৃথিবী তত্ত্ব বা মৃত্তিকা তত্ত্বের পরিধী। আর উপর চওড়া কুয়াশা বা বাদলের মত ঘিরে আছে। তারপর আছে ১০ কোটি যোজনের জলতত্ত্ব-এর ঘের। তার উপরে ১০০ কোটি (১ আরব) যোজনের অগ্নিতত্ত্বের ঘের। তার উপরে ১০০০ কোটি যোজনের (১০ আরব) মত আছে বায়ু তত্ত্বের ঘের। তার উপরে ১০,০০০ কোটি যোজনের (১ খরব) আকাশতত্ত্ব আছে। তারপর আছে এক লক্ষ কোটি যোজনের (১০ খরব) অন্ধকার। ৭ নম্বর আবরণ অব্যক্ত প্রকৃতির, যাকে অনন্ত বলা হয়েছে (স্কন্ধ পুরাণ, পেজ নং ১৪০)। এরকম অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড এক একটি মহাব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নিজ নিজ আবর্তে ঘূর্ণায়মান। মহাব্রহ্মাণ্ড মানে একটি Galaxy। অব্যক্ত প্রকৃতির বিস্তার প্রায় সীমাহীন আমাদের হিসাবে, এখানে প্রকৃতি পুরুষে (আত্মায়) বিলীন হয়ে যায়। যেমন তিলের মধ্যে তেল থাকে ঠিক তেমনি পুরুষ আর প্রকৃতি এখানে এক হয়ে থাকে। পুরুষ আর প্রকৃতির আলাদা হওয়াটাই দুঃখের আসল কারণ। প্রলয়কালে প্রকৃতির অন্তর্গত সকল লোককেই কালরূপ অগ্নি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করা হয়ে থাকে। এই অব্যক্ত প্রকৃতির উপর 'বিরজা' নদী আছে এর উপরের বৃত্তে প্রথমে ব্রহ্মা আছে তারপর ওই বৃত্তেরই আরো উপরের অংশে আছেন মহা ব্রহ্মা। তার উপরের বৃত্তে প্রথমে বিষ্ণু আর তারপর মহাবিষ্ণু আছেন। তারও উপরের বৃত্তে প্রথমে আছেন শিব আর তারপর আছেন মহাশিব। যে সূর্য মণ্ডলের ধরণীতে আমরা থাকি সেই মৃত্যুলোকে যত পর্যন্ত সূর্যালোক আসে ঠিক ততটাই উপরদিকে ধাবিত হয়। এই সূর্যের আলো যেখানে শেষ হয়ে যায় সেখান থেকে এই সূর্যের থেকেও হাজার গুণ বড় সূর্যের মণ্ডল (area) শুরু হয়ে যায়। এই সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে উপরের বৃত্ত যেখানে শেষ হয় সেখানেই প্রকৃতির সপ্ত আবরণ সমাপ্ত হয়ে যায়। সেখান থেকে পরমধামের সীমা শুরু হয়। এই পরমধামের বিষয়ে ভৌতিক মন-বুদ্ধির দ্বারা কিছুই বিচার করাটা অসম্ভব বলা হয়। যেখান থেকে চলার কারণে কারণ শরীর আর বায়ুতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। সেখান থেকেই ভোগী শরীর অর্থাৎ দুঃখের উৎপত্তি হয়। সেই কারণেই অসীমের পরমধামের মহাকাল বা মহাশিব তাঁর চক্ষুরূপী দিব্য বিমানের দ্বারা দিব্যস্বরূপ প্রদান করে অসীমের পরম আত্মাদের নিয়ে যাবার জন্য বর্তমানে পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে অবতরণ করেছেন।

(৬) আত্মান্তিক প্রলয় বা মোক্ষ ঃ

জ্ঞান হবার পর যখন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপে স্থিত হয়ে যায়, আত্মা স্থুল পাঁচ তত্ত্বের শরীর থেকে প্রচেষ্টা করে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে নেয়। অর্থাৎ আত্মা আকাশ বায়ু আর অগ্নি এই তিন তত্ত্বের শরীর ধারণ করে নেয়, তারপর তিন তত্ত্বের শরীর থেকে প্রচেষ্টা করে পরমতত্ত্বের শরীর বা 'কারণ শরীর' ধারণ করে নেয়।

'কারণ শরীর' মন এবং বুদ্ধি দিয়ে তৈরি হয়। 'কারণ শরীর' সতোপ্রধান হবার কারণে তাতে Golden চৈতন্য শক্তি থাকে। 'কারণ শরীরকে' আরো তেজময় করে 'মহাকরণ শরীর' অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তি করে নেয়। তাকে বলে কৈবল্য অবস্থা। তখন মানুষের নিজের প্রতিই বৈরাগ্য এসে যায়। এরই নাম আত্মন্তিক প্রলয়। একে মোক্ষও বলা হয়।

Solar System বা ব্রহ্মাণ্ডের বর্ণনা

এক একটি 'মহাব্রহ্মাণ্ডে' (Galaxy) আরব খবর ব্রহ্মাণ্ড (Solar System) আছে। এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক এক এক জন শিব। তাই এরকম আরব খরব শিব রয়েছে। যে ভারতবর্ষে আমরা থাকি সেটা আমাদের অসীমের পরমধামের সেন্টার পয়েন্ট। শিব একটি তত্ত্ব; যা নিরাকারী আর আকারী দুটি রূপেই বিদ্যমান। এনার জন্ম পরম তত্ত্ব থেকে হয় তাই এনাকে পরমাত্মাও বলা হয়। শিব একটি কালতত্ত্ব যা কিনা সময় হলে কালাগ্নির রূপ ধারণ করতে পারে। যখন কোনো আত্মা প্রচেষ্টা করে এই stage-এ পৌঁছায় তখন তাকে শিবত্ব প্রাপ্তি বলা হয়। Galaxy-র মালিক 'মহাশিব' যখন নিরাকারী শিবকে তাঁর সঙ্কল্পশক্তির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড বা solar system বানানোর জন্য বলেন, তখন শিব আকারী রূপ ধারণ করে শক্তি (অম্বিকা)-র রচনা করেন। তারপর শিবও শক্তি মিলে বিষ্ণুর রচনা করেন। বিষ্ণুর নাভি থেকে পদ্মফুল নির্গত হয়। শিবের দ্বারা পদ্মফুল থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মা সপ্তঋষিদের জন্ম দেন। সপ্তঋষি মনু শতরূপা আর মনু-শতরূপা প্রজাপতির রচনা করেন। প্রজাপতি দেবী-দেবতাদের রচনা করেন। দেবী দেবতাদের দ্বারা তাদের পুত্র-কন্যারা জন্ম নেন। এইভাবে বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে।

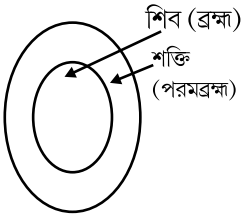

চিত্র - ৭

সবার প্রথমে শিব নিরাকারী ছিলেন। চিত্র নং৭ দেখুন ভিতরের বীজকে শিব বা ব্রহ্ম বলে। আর বাইরের যে কবচ তাকে শিবের তেজ বা পরমব্রহ্ম বলা হয়। এটাই শিবের 'শক্তি' যিনি শিবকে রক্ষা করেন। শিবের উপরে কবচের কাজ করেন। এই সংসারে যখন কিছুই ছিল না, তখন শুধু শিবশক্তির একটি প্রকাশিত আলোকপুঞ্জ ছিল। যাকে স্বয়ম্ভুও বলা হয়। চিত্র নং ৭-এ যেটা দেখানো হয়েছে, সৃষ্টির প্রথমে শুধু এই সর্বোচ্চ পরমধামই ছিল। বেদান্ত দর্শনে বলা হয়েছে যে, যখন পরমব্রহ্মের 'সৃষ্টি' রচনা করার ইচ্ছা হ'ল তখন তাঁর সঙ্কল্প হল

যে—'আমি এক থেকে অনেক হয়ে যাই'। তখন শিব নিরাকারী থেকে আকারি হলেন, আর আকারী শিব থেকে অম্বিকার রচনা হল। আর তারপর শিব-অম্বিকার মিলিত শক্তি (থেকে নারায়ণ ও নারায়ণের শরীর থেকে লক্ষ্মীর সৃষ্টি হয় (চিত্র নং-২ দেখুন)। জলের অন্য নাম 'নীর'। কারণ এর উৎপত্তি নরের থেকে হয়েছে। বিষ্ণুকে ক্ষীরদ সাগরের উপরে শেষনাগের শয্যায় দেখানো হয়েছে। নার (জল) আয়ন (নিবাস স্থান) = নারায়ণ। নার + আয়ন = নারায়ণ, বিষ্ণুর অপর নাম। বিষ্ণু যোগনিদ্রায় থেকে নিজেরই স্বরূপকে ধ্যান করেন। তখন তাঁর নাভি থেকে কমল অর্থাৎ পদ্মফুলের উৎপত্তি হ'ল। শিব সেই কমলের উপরে ব্রহ্মার সৃষ্টি করলেন। শিবের শক্তি থেকে একটি পিণ্ড তৈরি হল যাকে ব্রহ্মার শরীর বা ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়। এই পিণ্ডের দুটি ভাগ হল উপরের ভাগ ভুবর্লোক আর নিচের ভাগ ভূলোক। এটি আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলা হয়েছে। এমনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে এই পরমপিতার সৃষ্টিতে। এক একটি ব্রহ্মার আয়ু ১০০ বছর (ব্রহ্মার হিসাবে)। একটি ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মার বিষ্ণুর আর শিবের আয়ু সমান। শিব যখন পরমতত্ত্বে থাকেন তখন তার মধ্যে শিবত্ত্ব বা পজিটিভ পাওয়ার থাকে। আর যখন তিনি ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেন তখন তাঁর পাওয়ার কমে যায়। তখন তিনি দুঃখী হয়ে কালরূপ ধারণ করে নিজের শক্তিকে গুটিয়ে নিতে চান তখন ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডকে গুটিয়ে নিয়ে বিষ্ণুর ভিতর আর বিষ্ণু শিবলোকে চলে যান। শিবলোক বিনাশ হয়না। শিব পুরো ব্রহ্মাণ্ডকে নিরাকারী পরমধামের পাওয়ারের এক সেল বনিয়ে নিজের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নেন। তখন ব্রহ্মার ১০০ বছরের নেগেটিভিটির কারণে তা জ্বলতে শুরু করে। তাই শিব একটি লাইটের গোলা হয়ে যান। তখন শিব নিজের পাওয়ারকে পজিটিভ করার জন্যে তাঁর সৃষ্টি কর্তা মহাশিব বা Galaxy-র মালিকের ভিতর বিলীন হয়ে যান। তখন 'মহাশিবের' যদি অন্য একটি ব্রহ্মাণ্ড বানানোর হয়, তখন যে অন্য শিবেরা অপেক্ষা করে থাকেন, তাঁদের কাউকে সঙ্কল্পের দ্বারা বলে দেন তুমি গিয়ে নতুন একটি ব্রহ্মাণ্ড তৈরি কর। একজন শিবের আয়ু ব্রহ্মার ১০০ দিনের সমান অর্থাৎ ৩৬,০০০ কল্প পর্যন্ত হয়। তারপর এই ব্রহ্মাণ্ডের শিব বদল হয়ে যায়।

কেন কোনটায় প্রতিটা কল্পে আলাদা আলাদা ড্রামা হয়। মহাকল্পে আলাদা আলাদা ড্রামা হয়। শাস্ত্রগুলিতে জ্ঞান এমনভাবে আছে যেমন আটার মধ্যে লবণ মেশানো থাকে। ব্রহ্মার ১০০ বছর পূর্ণ হলে শাস্ত্রও লুপ্ত হয়ে যায়। তারপর অন্য ব্রহ্মা নিজের মত করে অন্য গল্পের শাস্ত্র রচনা করেন। শাস্ত্রতে শুধু এটাই লিখে দেওয়া হয় যে অনন্ত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বার বার সৃষ্টি ও বিনাষ হয়, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড কতবার পুনর্গঠন হয় সেটা শাস্ত্রতে লেখা হয় না। শাস্ত্রে কেবলমাত্র ইশারা থাকে যেমন 'দৈবী ভাগবতে' পৃষ্ঠা নং ৬৩৯-এ লেখা আছে যে মহাবিরাটের রোমকূপের মধ্যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান। পেজ নং-৬৪১-এ আছে যে এক একটি ব্রহ্মাণ্ডে আলাদা ব্রহ্মা-বিষ্ণু আর শিব আছেন। যেমন 'পরলোক আর পুনঃর্জন্ম'-তে বলা হয়েছে যে, যুগে যুগে প্রতি মুহূর্তে অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি আর ধ্বংস হয়। যুগে যুগে মানে সময়ের চাকায় আর প্রতি মুহূর্তে মানে মহাশিবের ১ সেকেন্ড। শিব আর ব্রহ্মার আয়ুর ১০০ বছর সমান মহাশিবের ১ সেকেন্ড হয়।

ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বর কে দেবতার আখ্যান দেওয়া হয়েছে কিন্তু হিমালয়বাসী শঙ্কর দেবতা নয়। শঙ্কর শিবের রচনা। শিবের থেকেই শঙ্করের জন্ম হয়। শিবের আকারী স্বরূপের একটি সেল থেকে শঙ্করের সৃষ্টি হয়েছে। শঙ্কর নিজের আকারী স্বরূপ থেকে একটি সেল পবন দেবতাকে অর্পন করলেন। তখন পবন আর শঙ্করের রুদ্ররূপ থেকে হনুমান এর জন্ম হ'ল। হনুমানজীকে শঙ্করের ১১তম রুদ্রাবতার বলা হয়। 'শিবপুরাণে' আছে শিবের ২৮টি অবতার, তার মধ্যে 'শঙ্কর' হলেন অন্যতম এক রূপ। 'স্কন্ধপুরাণ' অনুযায়ী বিষ্ণুপুরী আর রুদ্রলোক বা শিবপুরী এই ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে বানান হয়। এক একটি শিব-শক্তির আয়ু ব্রহ্মার ১০০ বছরের সমান হয়। আর একটি মহা ব্রহ্মাণ্ডের (Galaxy) আয়ু এক লাখ মহা কল্পের সমান হয়। প্রত্যেকটি ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা আলাদা আলাদা শিব-শক্তি হয়। যখন মহাশিব অনন্ত অনন্তকোটি শিবশক্তির দ্বারা অনন্ত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করান তখন এক একজন শিব এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা হন। অনেক আরব খারব ব্রহ্মাণ্ড মিলে এক একটি মহাব্রহ্মাণ্ড (Galaxy) তৈরি হয়। একটি মহা ব্রহ্মাণ্ডের আয়ু এক লাখ মহাকল্পের সমান হয়। এই বেহিসাব ব্রহ্মাণ্ডগুলির (Solar System) এক একটির আয়ু ব্রহ্মার ১০০ বছরের সমান হয় কিন্তু প্রতিটা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি আর বিনাশের সময় এক হয় না। তাদের কোনোটা হয়তো সৃষ্টি হচ্ছে আর অন্যটা সেই সময় বিনাশ হচ্ছে বা মধ্য সময় চলছে। কখনো এটা আর কখনো ওটার আয়ু শেষ হয়ে চলেছে। প্রত্যেকটা ব্রহ্মাণ্ডের জন্য আলাদা আলাদা ব্রহ্মা-বিষ্ণু আর মহেশ্বর রয়েছেন। তাঁদের দেবতা বলা হয়। কিন্তু পরমাত্মা বলা হয় একমাত্র শিবকে। 'ব্রহ্মা দেবতায়ে নমঃ—বিষ্ণুদেবতায়ে নমঃ—শঙ্কর দেবতায়ে নমঃ' আর শেষে 'শিব পরমাত্মায়ে নমঃ'—বলা হয়। তো শিবকে পরমাত্মা বলা হয় কারণ শিবের জন্ম পরম তত্ত্ব থেকে হয়। তাহলে সকল ব্রহ্মাণ্ডের সকল 'শিব' হলেন 'পরমাত্মা'। আর Galaxy-র মালিক 'মহাশিব' হলেন 'মহা পরমাত্মা'। ঠিক সেই ভাবে সকল Universe বা পরম মহাব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা 'পরম মহাশিব' হলেন 'পরম মহান পরমাত্মা বা 'পরম মহাকাল স্বরূপ'।

তাহলে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের (Solar System) রচয়িতা কোটি কোটি 'শিব'। কেননা আরব খারব ব্রহ্মাণ্ড মিলে একটি মহাব্রহ্মাণ্ড বা Galaxy তৈরি হয়। তাই একটি মহাব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা হলেন একজন 'মহাশিব' বা 'মহাপরমাত্মা'। এমন অনন্ত কোটি Galaxy নিয়ে একটি Universe বা 'পরম মহাব্রহ্মাণ্ড' হয়। যার মালিক 'পরমমহাশিব'। ঠিক এমনি করে অনন্ত কোটি 'পরম মহাব্রহ্মাণ্ডের বা Universe-এর মালিক এক এক জন 'পরম পরম মহাশিব'। আর অনন্ত কোটি Universe নিয়ে গঠিত হয় একটি Great Universe. বোঝার জন্য যার নাম আমরা দিয়েছি G-1. এইভাবে অনন্ত অনন্ত বিস্তার আছে। যখন 'মহাশিব' 'পরম মহাশিবের' কাছ থেকে অনন্ত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড চালানোর মত পাওয়ার নিতে পারেন না। যখন 'মহাশিবের' পাওয়ার কমে আসে, তখন তিনি মহাকাল রূপ ধারণ করে সকল ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের যে সকল রোমকূপ থেকে তাদের সৃষ্টি করেছিলেন সেই সকল সেলের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিয়ে দেন। মহাব্রহ্মার বিনাশ তখনই হয় যখন তিনি পুরো ব্রহ্মাণ্ডের পাওয়ারকে নিজের মধ্যে টেনে নেন। এতে কেমন সময় লাগে? একটি মহাব্রহ্মাণ্ড

বা Galaxy-র আয়ু ব্রহ্মার ১ লাখ মহা কল্পের সমান হয়। যখন মহাশিব দেখেন যে এই চলন্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলির পাওয়ার শেষ হয়ে এসেছে তখন তিনি মহাকাল হয়ে সকল Solar System (ব্রহ্মাণ্ড)-এর পাওয়ারকে একত্রিত করে নিজের মধ্যে ঢুকিয়ে নেন। আর তখন ওনার মধ্যে সকল ব্রহ্মাণ্ডের নেগেটিভিটি ভরে যায়, যার কারণে তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। তিনি দুঃখে জ্বলতে থাকেন এবং নিজেকে চার্জ করার জন্যে তিনি 'পরম মহাশিবের' ভিতর প্রবেশ করেন। কারণ তিনি পরম মহাশিবেরই সৃষ্টি অংশ। 'মহাশিবের' এক মুহূর্ত বা ১ সেকেন্ড 'পরম মহাশিবের' ১ সেকেন্ডের কোটি ভাগের ১ ভাগ হয়। আর মোটামুটি ৫০০ কোটি 'পরম মহাশিব' আছেন যারা কিনা পরম মহাব্রহ্মাণ্ড বা Universe-এর রচয়িতা। তাহলে দেখা যাচ্ছে ৫০০ কোটি 'পরম মহাব্রহ্মাণ্ড' রয়েছে। 'পরম মহাশিবের' রচয়িতা হলেন সূক্ষ্ম দেশে বাসী ৬.৫ কোটি 'পরম পরম মহাশিব'। ৬.৫ কোটি 'পরম পরম মহাশিবের' রচয়িতা ২ কোটি 'মূল দেশের বাসী'। ২ কোটি 'মূল দেশের বাসীর' রচয়িতা ৯ লাখ 'পরমধাম বাসী'। ওই ৯ লাখ-এর রচয়িতা ১৬১০৮ আর ১৬১০৮ এর রচয়িতা বিষ্ণুর মালার ১০০৮ আর এই ১০০৮ এর ও রচয়িতা হলেন ১০৮ বীজরূপী আত্মা। এই ১০৮ হলেন পদ্মাপদধারী মহাশিব। এঁদের রচয়িতা ২৪ আর ২৪-এর রচয়িতা ১২ আর ১২-র ও রচয়িতা ৮ (অষ্ট রত্ন) এবং এই ৮ রত্নের রচয়িতা হলেন স্বয়ং অসীমের মহাশিব পরমপিতা 'ভগবান' আর আর 'মহাশক্তি'।

৬. অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মহাকাল প্রলয়

অসীমের অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মহাকাল প্রলয়/অসীমের মহাকাল চক্র/ অসীমের সময়চক্র ঃ-

অসীমের ভগবান—ভগবতী, অসীমের মহাকাল–মহাকালী, অসীমের মহাশিব–মহাশক্তি তথা অসীমের পরমব্রহ্ম–পরমেশ্বরের থেকে শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই। যাঁর থেকে অধিক বৃহৎ অধিক সূক্ষ্ম আর অধিক মহান কেউই নেই। অসীমের ভগবানই অনাদি সত্য। উনিই হলেন 'অনাদি মহাকাল' যাঁকে সীমিত করা যায় না। অসীমের মহাকাল, কালাতীত 'ভগবান'ই এই অসীমের ব্রহ্মাণ্ডের, সৃষ্টির প্রশাসক। উনিই হলেন সত্-অসতাতীত অসীমের অমৃত। অসীমের ব্রহ্মাণ্ড বা অসীমের তিনলোক (মূলদেশ + সূক্ষ্মদেশ + স্থূল দেশ), অনন্ত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড রূপে ওনার প্রতিটি রোমকূপের মধ্যে বিরাজমান। উনিই হলেন অসীমের সৃষ্টির মহাবিরাট স্বরূপ। 'পরলোক আর পুনঃজন্ম' বইটিতে (নতুন পেজ নং ৬ + ৭ আর পুরোনোতে পেজ নং ২+৩) বলা হয়েছে যে, অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে গঠিত এই সংসারের এক একটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত অনন্ত জীব আছে যাদের প্রতিটি জন্মে অনন্ত অনন্ত কর্ম আছে। আর প্রত্যেকটি কর্মের অনন্ত অনন্ত ফল হয়। তাই অনন্ত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তৈরি হয়, সেখানে অনন্ত অনন্ত পরমতত্ত্ব বিরাজমান। অসংখ্য অসংখ্য রঙ এবং রংসমন্বয় (colour combination) আছে। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড আলাদা আলাদা পরমতত্ত্ব দিয়ে তৈরি হেতু প্রত্যেক জিনিসের বা প্রাণীর রূপ, রং এবং আকৃতি স্বতন্ত্র। কারো সাথে কারোর কোনো মিল নেই। সেখানকার কল্পনা করাটাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব। প্রত্যেকটি ব্রহ্মাণ্ডের জন্য আলাদা আলাদা ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং শিব আছেন, কিন্তু

অসীমের 'মহাকাল পুরুষ' এক এবং অনাদি 'ভগবান' যিনি এই সম্পূর্ণ সংসারের সৃষ্টি কর্তা তিনি 'একমেবদ্বিতীয়ম'—এক এবং অদ্বিতীয়, যাঁর অসীমের শক্তি হলেন 'অসীমের মহাকালী'। 'light and might' অর্থাৎ 'ভগবান' এবং 'ভগবতী'। আলোর স্বরূপ হলেন অসীমের 'পরমপিতা' (পুরুষ) আর তাঁর প্রকৃতি 'ভগবতী' হলেন প্রকাশ বা আলোর কিরণ, আমাদের অসীমের পরম মাতা। এনারা হলেন কালের অতীত, দেশের অতীত, যাঁদের দেশ এবং কাল সীমিত করতে পারে না। যাঁদের 'নির্গুণ ব্রহ্ম' বলা হয়। যখন তাঁরা আকারী রূপ ধারণ করেন তখন তাকে বলা হয় অসীমের 'জ্যোর্তিরব্রহ্ম' আর যখন ওনারা সাকারী রূপে আসেন, তখন বলা হয় অসীমের 'সগুণ ব্রহ্ম'। অসীমের পরম ধামের এই তিনটি রূপকে এবং অসীমের পুরুষোত্তম তত্ত্ব বলা হয়। অক্ষয় তত্ত্ব তিনপ্রকারের হয়। এই তিনএর স্বরূপ অবিনশ্বর বা চিরস্থায়ী।

(১) সগুণ ব্রহ্ম = অর্থাৎ অসীমের পরমপিতার সাকারী স্বরূপ

(২) জ্যোতিব্রহ্ম = অর্থাৎ অসীমের পরম পিতার আকারী স্বরূপ

(৩) নির্গুণ ব্রহ্ম = অর্থাৎ অসীমের পরমপিতার নিরাকারী স্বরূপ

অক্ষয় ব্রহ্মকে পুরুষোত্তম তত্ত্বও বলা হয়। তা পরমধামের ৩টি স্বরূপকে দর্শায়। অসীমের অবিনাশী পুরুষোত্তম তত্ত্ব একটাই যা এই তিন স্বরূপকে ধারণ করে থাকে। অর্থাৎ,

অসীমের পুরুষোত্তম = ১/৩ সগুণ ব্রহ্ম + ১/৩ জ্যোতিব্রহ্ম + ১/৩ নির্গুণ ব্রহ্ম = ১ পরমপুরুষ

ইনিই আসীমের পরম ব্রহ্ম আর ইনিই অসীমের পরম মহাশিব।

এক পুরুষোত্তম তত্ত্বই তিনটি ভাগ হয়ে তিনটি রূপে বিরাজ করেন। এই হল অসীমের অক্ষয় ব্রহ্ম যা চিরদিন অবিনাশী থাকে। এই পুরুষোত্তম তত্ত্বই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, অখণ্ড সত্য। তাঁর অসীমের 'মহাশক্তি' নিজস্ব শক্তি স্বরূপা। ভগবান এবং ভগবতী অভিন্ন সত্ত্বা, যাঁরা কিনা যোগের দ্বারা কখনো পৃথক আবার কখনো এক হয়ে যান। অসীমের মহাকালী বা 'মহাশক্তি' হলেন স্বয়ং 'ঈশ্বরের' অর্ধেক শক্তি যাঁকে কিনা অসীমের পরমেশ্বরী বা জগদীশ্বরী বলা হয়। উনিই হলেন সকল সৃষ্টির মাতা, 'জগৎজননী'।

অসীমের মহাকালের প্রলয় অসীমের পরম পিতা স্বয়ং ভগবান, অসীমের মহাকাল-ই করেন। সারা জগৎসংসার বিনষ্ট হয়ে যাবার পরও একমাত্র অসীমের সদাশিবই বিরাজমান থাকেন। বৃহৎ এই অনন্ত সৃষ্টির উৎপত্তির সময় এই 'ব্রহ্মময় তত্ত্ব' থেকে প্রকাশিত পরম আলোকপুঞ্জের ঘর্ষণ হওয়াতে অসীমের নিরাকারী, আকারী আর সাকারী সৃষ্টির উৎপত্তি হতে অসীম অনন্ত সময় লাগে। বেদান্ত দর্শনে এর বর্ণনা দেওয়া আছে। পরমব্রহ্মের সঙ্কল্প এল যে, 'আমি এক থেকে অনেক হয়ে যাই'। এই অসীমের জ্যোতিস্বরূপ মূল অনাদি চেতনা শক্তিই সমস্ত জড় আর চেতনের উৎপত্তির মূল কারণ। অসীমের মহাকালের প্রলয়ের সময় সারা জগৎ সংসারে স্থূল শক্তিগুলি, সূক্ষ্ম আর সূক্ষ্ম থেকে অতি সূক্ষে আর অতি সূক্ষ্ম থেকে নিরাকারীতে পরিণত হয়ে যায়। এই অব্যক্ত শক্তিগুলি পারদের ফোঁটার মত গুটিয়ে গুটিয়ে একত্রিত হতে হতে এক উজ্জ্বল আলোক পুঞ্জর পরম লাইটের-এর গোলা হয়ে যায়। যাকে 'স্বয়ংভূ' বা 'পরমব্রম্ভ' বলা হয়। সারা সংসার (অসীমের স্থূল, সূক্ষ্ম আর মূল দেশ) ওই power house এ বিলীন হয়ে যায়। আর এটাই হল অসীমের শিব

শক্তির আধ্যাত্মিক নিবাস স্থান। মানব শরীরে এই স্থান মস্তকের মধ্যেস্থিত সহস্র কমলের পাপড়ীর মধ্যে অবস্থান করে। অনন্ত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে ভেদ করতে পারলে তবেই তার প্রাপ্তি হয়। বিজ্ঞানে Low of Conservation of energy'—এটাই বলে যে, In this universe energy can neither be created and nor be destroyed, but if is transferable (Changable), but it can be transferred (Changed) from one form to another form, But the total sum of energy remains constant.

যখন এই সৃষ্টিতে কিছু ছিল না; না স্থূল দেশ ছিল, না সূক্ষ্ম দেশ ছিল, আর না মূল দেশ ও নিরাকারী দুনিয়া ছিল, তখন তাহলে কি ছিল? সৃষ্টি কখনোই অনাথ হয়না। এক অসীমের পাওয়ার হাউজের প্রকাশিত পুঞ্জের পরম লাইটের গোলা ছিল। যাকে 'অসীমের পরমব্রহ্ম' বলা হয়। অনন্ত সময়ের অনন্ত কাল ধরে ওই power-এর বিভাজন হতে হতে নিরাকারী থেকে আকারী আর আকারী থেকে সাকারী দুনিয়ায় পরিণত হয়েছে। 'কল্কিপুরাণে' বলা হয়েছে যে, স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে এমন একজন অলৌকিক মহাপুরুষের জন্ম হবে যিনি বৈজ্ঞানিকের ও বৈজ্ঞানিক হবেন। তিনি আত্মা আর পরমাত্মার রহস্যকে উন্মোচন করবেন। উনি আত্মজ্ঞান দান করবেন। ওনার বেশ-ভূষা সাধারণ হবে আর স্বাস্থ্য হবে বালক সদৃশ। শাস্ত্রের প্রকাণ্ড পণ্ডিত আর মানবতাবাদী হবেন তিনি। উনিই হবেন 'কল্কি অবতার' ওনার জন্ম গুজরাটের আমেদাবাদ শহরে হবে।

আত্মারা কি করে সৃষ্টি হল, কেনই বা হ'ল, আর কবেই বা হ'ল? এই যে সঙ্কল্প সেটাও বা কি করে তৈরি হল? প্রথমে ডিমের সৃষ্টি হয়েছে না মুরগির সৃষ্টি হয়েছে? এ সকল প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানী রাও দিতে পারে না। কেননা বিজ্ঞানের উপরে সাইলেন্সের শক্তি আছে, আর সাইলেন্সের উপরে আছে পরমাত্ত্বিকশক্তি। এই সীমাবদ্ধ আর অসীমের ব্রহ্মাণ্ড কি করে তৈরি হ'ল, কেনই বা হ'ল, আর কবেই বা হ'ল? এই সীমা ও অসীমের History আর Geography কিভাবে তৈরি হল? এই অসীমের চার ধাম কি করে তৈরি হ'ল? যদি আপনি এই সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানতে চান তো আমাদের YouTube Channel দেখুন। Link: www.youtube.com/anant98251. যদি আপনার মধ্যে পরমসত্য, অসীমের পরম পিতা আর পরম মাতার পরিচয় জানার ইচ্ছা থাকে তো, ঐ সাক্ষাৎ অসীমের মাতা-পিতা অসীমের মহাশিব আর মহাশক্তি সাকার রূপ নিয়ে এই ধরনীতে অবতরণ করেছেন। আপনারা ওঁনাদের দিব্য জ্ঞানের দ্বারা চিনতে পারবেন। যদি আপনি বিশ্ব কল্যাণের নিমিত্তে সহযোগী হয়ে নিজের অসীমের ভাগ্য বানাতে চান তো, যদি আপনার ভিতর অসীমের জ্ঞান পিপাসা থাকে তো, যদি আপনি সকল ইচ্ছার উর্দ্ধে উঠে অসীমের বৈরাগী হতে পারেন তো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যোগাযোগ করুন। কেননা সকলের সহযোগীতাতেই এই সংসার সুখের হবে। অসীমের ভগবান আর ভগবতী চাইলে ১ সেকেন্ডের মধ্যে সারা দুনিয়াকে ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত বানাতে পারেন। প্রতিটা ব্রহ্মাণ্ড, মহা ব্রহ্মাণ্ড আর পরম মহা ব্রহ্মাণ্ডকে ১ সেকেন্ডের মধ্যে নিজের মহাবিরাট স্বরূপ, মহাকাল স্বরূপে গুটিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাগ্য তাহলে কি করে তৈরি হবে? এরকম যেন না হয় যে, সময় চলে গেলে রক্তের অশ্রুধারা বইয়ে কেঁদে কেঁদে আপনাদের অনুতপ্ত হতে হয়! এখন আর অল্প সময়ই বাকি আছে অসীমের মহাকাল চক্রের পুনরাবর্তন হতে। এই সমগ্র সৃষ্টি অসীমের মাতা-পিতার

মধ্যে ১ সেকেন্ডে বিলীন হয়ে যাবে। অসীমের ভগবান আর ভগবতী এই সংসারে অসীমের বীজদেরকে খোঁজার জন্য এসেছেন। ওনারা ১০৮ জন আছেন। তাদের সঙ্গে সহযোগিতার আরো ১০০৮ এবং ১৬১০৮ আছেন। হয়তো এমনও হতে পারে যে আপনি তাদেরই মধ্যে একজন! অসীমের পরম পিতা অসীমের বীজদেরকে বাঁচিয়ে, দিব্য স্বরূপ প্রদান করে, তাঁর দিব্য বিমানে করে নিয়ে যেতে এসেছেন। তাঁর একটাই জন্ম, একবারই আসেন তিনি। সারা সৃষ্টিকে এক পুষ্পক বিমান বা লাইট স্বরূপের বেলুনে করে নিজের নয়নে বসিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। এই অসীমের মাতা-পিতার জন্ম দিব্য আর অলৌকিক। তার জন্য শাস্ত্রে কেবল নামমাত্র ইশারাই দেওয়া হয়েছে যে, 'পরমপিতা পরমাত্মাকে কোটির মধ্যে একজন, তারও মধ্যে একজন অর্থাৎ খুবই সামান্য সংখ্যক বিরল ব্যক্তিই চিনতে পারবেন। কারণ, তাঁরা মনুষ্য অবতারে সাধারণ নর-নারী মতই দেখতে হবেন। এর জন্য বলা হয়েছে যে, তাঁদের সঙ্গে যারা থাকবেন তারাও তাঁদের চিনতে পারবেন না। যাঁর মধ্যে সমগ্র বিশ্বকে পরিবর্তন করার শক্তি আছে, সমগ্র বিশ্বের আদি মধ্য আর অন্তের জ্ঞান আছে, যাঁর মধ্যে অসীমের সারা বিশ্বকে পরিবর্তন করার বৃহৎ ভাবনা সেই অসীমের পরম পিতা হবেন। কারণ যাঁর থেকে এই সীমাবদ্ধ ও অসীম দুনিয়া তৈরি হয়েছে, তিনিই একমাত্র অসীমের পরম পিতা।

অসীমের কাল চক্রের পুনরাবর্তন

কাল অর্থাৎ সময়, প্রতি সেকেন্ড, প্রতি মুহূর্তে সময় পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের আধার কি? গতি বা Motion। বিজ্ঞানেও বলা হয় যে সময় গতিশীল। তাহলে এই গতি কোথা থেকে মেলে? Power থেকে। অসীমের Power থেকে। অসীমের পাওয়ার হাউজ কে? অসীমের মহাশিব-শক্তি অর্থাৎ অসীমের মহাকাল এবং মহাকালী।

একটি অব্যক্ত আত্মা অনেক জীব আত্মায় বিকশিত হয়েছে, এক অনাদী সংকল্প থেকে অনেক সঙ্কল্পের জন্ম হয়েছে, এক দেশ থেকে প্রচুর দেশ তৈরি হয়েছে, একটি ইচ্ছা অনেকগুলি ইচ্ছাতে পর্যবসিত হয়েছে, একটি বুদ্ধি অনেকগুলি বুদ্ধিতে রূপান্তরিত হয়েছে, একটি মন অনেকগুলি মনে বিভক্ত হয়েছে আর একটি মহাবিরাট শরীর অসংখ্য শরীরে বিভাজিত হয়েছে। 'মহাকাল' (অসীম শক্তির গোলা) ও 'পরমমহা' অর্থাৎ বিরাট স্বরূপ থেকে পরমাণুর আকার পর্যন্ত ভাগ হয়েছে। যে পরমাণুর আর বিভাজন সম্ভব নয়। ওই ১০০% পরম লাইটের অসীমের অসীমের শক্তিকে 'সয়ংভু' ও বলা হয়। ওই 'পরমমহানের' ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশকেই পরমাণু বলে। আর অসীমের 'পরমব্রহ্ম' বা শুধু 'ব্রহ্ম'ও বলা হয়। অসীমের আর সীমাবদ্ধ সংসারের এই বয়ে চলাকেই অসীমের কালগতি বলা হয়। এই দুনিয়ায় সবকিছুই গতিশীল, যদি এই গতিতত্ত্ব না থাকতো তবে সমগ্র সংসার সংকুচিত হয়ে solid বা কঠিন হয়ে এক হয়ে যেত। শুভ কর্ম করলে গতি হয় স্বর্গ বা তদুর্ধ্ব লোকের দিকে।

এটা কোনো blind force বা অন্ধ শক্তি নয়।

গতি বা Motion একটি অব্যক্ত তত্ত্ব। বিজ্ঞানীগণ ও বলেন যে, গতি অর্থাৎ চলন বিনা কোন কিছুই সম্ভব নয়। এই 'গতি' অসীমের পরম মহাবিশব আর তাঁর শক্তি অর্থাৎ অসীমের মহাকাল আর মহাকালীর Power থেকে আসে। সমগ্র জগৎ সংসারের অনু-পরমাণু, প্রত্যেকটি সূর্য, তারা, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডল, গ্রহ, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু অসীম আর সীমাবদ্ধ এই ব্রহ্মাণ্ড, মহাব্রহ্মাণ্ড, পরমমহাব্রহ্মাণ্ড, প্রত্যেকটি লোক, পরলোক, জীব, পদার্থ এবং প্রতিটি তত্ত্বের অস্তিত্ব এই শক্তির দ্বারাই গতিশীল। শুভকার্যের দ্বারা জীবের গতি স্বর্গলোক বা তার চেয়েও ভালো কোনো উর্দ্ধলোকে হয় আর পাপকর্মের দ্বারা মানুষ্যের গতি পাতাল বা নরকের দিকে হয়। আবার ফিরে আসে এই লোকেই। এই গতি যখন ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তাকে ইচ্ছাশক্তি বলা হয়। জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয় তো জ্ঞানশক্তি বলা হয়। মানুষ দিনে মোটামুটি ২১,৬০০ বার প্রশ্বাস গ্রহণ করে আর নিঃশ্বাস ছাড়ে। এইভাবে রাতেও চলতে থাকে। 'কাল' এই শ্বাস থেকে অভিন্ন। কারণ, কাল শ্বাসের পরিমাপ হয়ে শ্বাস এর সাথেই ভিতরে যায়। তারপর শ্বাসের সাথেই বাইরে আসে। ঠিক এইভাবে মনের গতি, নাড়ির গতি, রক্তের গতি, বুদ্ধির গতি, জীবের গতি, পরম গতি এসব কালের সঙ্গে যুক্ত হয় তো তাকে 'কালগতি' বলা হয়। পুরুষের গতি পুরুষত্ব কারণ, কর্মগতিই সবার গতির কারণ। স্বভাব আর সংস্কার-এর বার বার পুনরাবর্তনই সময়ের পুনরাবর্তন। এই গতি তত্ত্ব না থাকলে সমগ্র সংসার প্রচেষ্টাহীন হয়ে যাবে, সারা জগৎ জড় পদার্থে পরণিত হবে আর কেউ পরতেও পারবে না। তাহলে এই দিনরাতের চক্র, বারের চক্র, শুক্লপক্ষ-কৃষ্ণপক্ষের চক্র, ঋতুচক্র, জ্যোতিষচক্র, এইভাবে দেবতাদের উত্তরায়ন-দক্ষিণায়নের চক্র চলে যা কিনা দেবতাদের দিন এবং রাত রূপে তাদেরও আয়ু শেষ করতে থাকে।

তারপর সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর কলিযুগের চক্র মনু-ইন্দ্র প্রভৃতির আয়ুকে হরণ করে। মনু-শতরূপার কালকে মন্বন্তর বলা হয়। ব্রহ্মার একটি দিনে ১৪টি মনু সমাপ্ত হয়ে যায়। ব্রহ্মার দিন-রাতের চক্রকে 'কল্প চক্র' বলা হয়। এক কল্পচক্র ব্রহ্মার ১০০ বছরের আয়ুতে সমাপ্ত হয়। একটি ব্রহ্মার অন্ত হলে কিছু সময় পরে আবার একটি ব্রহ্মার জন্ম হয়। এইভাবে সংসারের উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয় আর মহাপ্রলয়ের চক্র নিরন্তর চলতে থাকে। তাকে 'মহাকল্পচক্র' বলা হয়। জন্ম, যৌবন, পৌঢ়ত্ব ও মৃত্যুর পুনরাবর্তনই 'কালচক্র' যা একটি পিঁপড়ে থেকে ব্রহ্মা পর্যন্ত সবার পুনর্জন্ম সাধন করে। এই কালচক্র থেকে কেউই বাঁচতে পারে না। এটাই অসীমের ভগবান আর ভগবতীর স্বভাব-শক্তি (যোগমায়া) হয়ে অনু-পরমাণুতে প্রকট হয়, সকল জড়-চেতন পদার্থ, জীব শরীর, সীমাবদ্ধ ও অসীমের লোক ও পরলোকসমূহের নির্মাণ করে।

এটা বৈজ্ঞানিকদের অন্ধশক্তি নয়। এটা অসীমের মহাশিব আর মহাশক্তি, অসীমের মহাকাল আর মহাকালি, অসীমের ভগবান আর ভগবতীর 'পূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা যৌগিক ক্রিয়া শক্তি।' এটাই সমস্ত জীব এবং জড়, চেতন ও অচেতন পদার্থের স্বভাব ও সংস্কার রূপে দেখা যায়। যে ভাব বার বার প্রকট হয় সেটাই স্বভাব হয়ে যায়। স্বভাব সময় ও কালের অধীন। যার থেকে আমাদের বায়ুমণ্ডল তৈরি হয়। আর এই বায়ুমণ্ডল থেকেই আমাদের

প্রকৃতি বা শরীরের রচনা হয়েছে। এই স্বভাবচক্রই (বাসনাচক্র) কাল অর্থাৎ সময়ের চক্র। এই সীমা এবং অসীমের 'কালচক্র' কে সমাপ্ত করার জন্য অসীমের পরমপিতা পরমাত্মা সাকার রূপ নিয়ে ধরনীতে চলে এসেছেন। তাঁকে আপনারা দিব্য-জ্ঞান ও যোগস্বরূপের দ্বারা চিনতে পারেন। যিনি ভূতনাথ হয়ে সমগ্র সংসারকে স্থুল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে অতি সূক্ষ্ম, আর অতি সূক্ষ্ম থেকে নিরাকারীতে, আর নিরাকারী থেকে অসীমের প্রকাশিত পাওয়ার বা শক্তিপুঞ্জে পরিবর্তিত করে দেবেন। এই অসীমের ভগবান-ভগবতী জীবনের পঞ্চতত্ত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে, দিব্যস্বরূপ প্রদান করে অসীমের মুক্তি আর জীবন মুক্তি দিয়ে দিব্য বিমানের দ্বারা আপন নয়নে বসিয়ে এই মৃত্যু লোক থেকে অসীমের অমরলোকে নিয়ে যাবার জন্য সাকার রূপে অবতরণ করেছেন। আপনিও এসে অসীমের মাতা-পিতার সঙ্কল্পকে বাস্তবায়িত করে এই বিশ্বকে পরিবর্তন করে বিশ্বকল্যাণ কার্যে সহযোগী হয়ে নিজের ভাগ্য বানাতে পারেন। আসুন আপনাকে স্বাগত জানাই।

সময় হয়ে এসেছে অসীমের মহাকাল বাপ অসীমের কালাগ্নি রুদ্ররূপধারী বিরাট স্বরূপ ধারন করে পরম কালাগ্নি তত্ত্ব বর্ষণ করে সারা সৃষ্টিকে ব্যক্ত থেকে অব্যক্তে পরিণত করে নিজের মধ্যে বিলীন করে নেবেন। নিজের দিব্য তেজের দ্বারা সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে সূক্ষ্ম বানিয়ে এই মৃত্যুলোকের বিনাশ করে অসীমের অমরলোকে নিয়ে যাবেন যেখানে কেবল সীমাহীন পরমশান্তি আর শান্তি আর শান্তি বিদ্যমান।

অসীমের পরমধাম

যে প্রাণী বিবেকশীল বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত থাকে, সংযমিত আর পবিত্র ভাবে স্থিত থাকে, সে ওই পরমপদ পরমধামকে প্রাপ্ত করে। অমরতত্ত্ব তাকেই বলে যার মধ্যে কুটিলতা, অসত্য আর কপটতা নেই। আর সেই রকম ব্যক্তিই এমন বিকারহীন ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত করে। নিষ্কামকর্ম করার দ্বারা মৃত্যুকে জয় করে তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশে অমৃতের রস গ্রহণ করে। আনন্দময় পরমব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ প্রাপ্ত করে নেয়। পরমধাম-এর দিব্য স্বরূপের অনুভূতি মানে সাক্ষাৎ পরমাত্মারই প্রাপ্তি। কর্মাতীত, গুণাতীত, ভাবাতীত এই ত্রিগুণাতীত, ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপম, সত্যানন্দ স্বরূপম, নিত্যানন্দ স্বরূপম, অখণ্ডমঙ্গলাকারম, অতিন্দ্রীয় সুখেরও উপরে অমর তত্ত্ব। যেখানে মন মুদ্ধি আর সংস্কার থাকে না, আর না থাকে দিব্যদৃষ্টি। সেখানে সচ্ছন্দে বিচরণ হয়, সুখ আর দুঃখের বাইরে নিসংকল্প অবস্থা থাকে।

৭. আত্মার তিন প্রকার গতি ঃ পিতৃযান মার্গ, দেবযান মার্গ আর নিকৃষ্ট গতি

১. চাঁদে পিতৃলোক—পিতৃযান মার্গ

শরীর থেকে বার হয়ে লোক-লোকান্তর অথবা জন্ম জন্মান্তর পর্যন্ত যা যায় তা হ'ল সূক্ষ্ম শরীর। যাতে ৫ কর্মেন্দ্রিয়, ৫ প্রাণ, ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন আর বুদ্ধি এই ১৭টি তত্ত্ব আছে। এই ১৭টি তত্ত্বের মধ্যে মনই প্রধান।

মন চন্দ্রমার অংশ। তার জন্য চন্দ্রমার আকর্ষণে সেটা চন্দ্রলোকেই পৌছায়। যেমন মাটির ঢেলা পৃথিবীর দিকে আসে। পৃথিবী আত্মার Gravity Power দিয়ে তৈরি হয়েছে। তাই যে কোনো জিনিস উপর থেকে ফেললে সেটা উপর থেকে নিচে আসে কারণ পৃথিবীতে আত্মাদের গ্রাভেটি পাওয়ার বা মাধ্যাকর্ষণ বল আছে বলে। আর মন চন্দ্রের অংশ তাই মনের গুত্বাকর্ষণ চন্দ্রের সাথে আছে। মন চন্দ্রের কারক আর ওটাই পিতৃলোক। এইজন্য মানুষের পিতৃলোকে গতি হয়। এটাই পিতৃযান মার্গ।

২. দেবযান মার্গ

বুদ্ধিতত্ত্ব সূর্যের অংশ। তপস্বী-যোগী যারা প্রবল উপাসক তারা দিব্যবুদ্ধিকে শক্তিশালী করে মনকে কনট্রোল করে নেয়। সাইন্সের হিসাবে জ্ঞান বেশি পাওয়ারফুল হয়, তাই তাদের উপর জ্ঞানসূর্যের আকর্ষণ হয় আর তারা জ্ঞান সূর্যের দিকে ধাবিত হয়ে যায়। একেই দেবযান মার্গ বলা হয়েছে, যা কিনা স্বয়ং প্রকাশমান।

৩. তৃতীয় প্রকারের বা নিকৃষ্ট গতি

এটা সবচাইতে নিম্নমানের গতি, যাকে জঘন্য বা নিকৃষ্টগতি বলা হয়। পৃথিবীর যেকোনো পদার্থ, ধনসম্পদ, পশু, গৃহ, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিতে যাদের মন অধিক ফেঁসে যায় তাদের মনের উপর পৃথিবীর আবরণ চড়ে যায়। যেমন বাঁশের ভাসার শক্তি থাকলেও যদি প্রচুর পরিমাণে মাটি তার উপর লেপটে দেওয়া হয় তো সেটা ডুবে যায়, ঠিক তেমনি করে তাদের আত্মা ভারি হবার ফলে আর উপরের লোকগুলির দিকে উঠতে পারে না। আর তেমনি দেহের পদার্থের প্রতি অধিক বাসনা হলে, তার মনের শক্তি চাপা পরে যায়। তার চন্দ্রলোকের গতি হয় না। বারবার উৎপন্ন হওয়া আর দিনে শত শত বার মৃত্যু হওয়া কীট-পতঙ্গের প্রবাহে পরে যায়। বার বার জন্ম আর মৃত্যুর চক্র চলতে থাকে। শাস্ত্রে এই গতিকে অত্যন্ত খারাপ গতি মানা হয়েছে। এর থেকে উদ্ধার পাওয়া বড়ই কঠিন। চুরাশিলাখ যোনির চক্করে পড়ে থাকে। যদি অসীমের মাতার কৃপা হয় তাহলে তারা কর্মের ফল ভোগ করতে করতে প্রচুর সময় পরে (কালান্তরে) আবার মনুষ্য যোনিতে আসতে পারে। এই কারণে ভারতীয় সংস্কৃতিতে বলা হয় যে, মৃত্যুর সময়ে কোন ব্যক্তির সামনে দেহ আর মোহের কথা আলোচনা করতে নেই। তাই যখন কেউ মারা যায় তখন সবাই 'রাম নাম সত্য' বা 'হরিবোল' বলে।

ক্যায়ামতের দিন

মুসলিম ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন যে, ক্যায়ামতের দিনে আল্লাতালা আলোর স্বরূপে এসে, কবর থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবেন, হয়তো ফরিস্তা বানিয়ে জন্নতে নিয়ে যাবেন, আর নয়তো শয়তান বানাবেন। এখন সেই ক্যায়ামত বা শেষের সময়টাই চলছে। কবর থেকে বেরিয়ে বেরিয়ে তিন তত্ত্বে আসছে সব। অসীমের মহাকাল সকল ভূতকে নাশ করে মুক্তি দিয়ে দেবেন।

৮. অব্যক্ত বাণী (ব্রহ্মাকুমার ও কুমারীদের জন্য)

ভারতের মাউন্ট আবুতে ব্রহ্মাকুমারী আশ্রমে যে পরমাত্মার অব্যক্ত বাণী চলে তাতে বলা হয়েছে যে,

৯.১.৭৫, (পেজ নং ১১) অপেক্ষা করার বদলে ব্যবস্থা করো।

১৬.১.৭৫—আলোকিত অবস্থা।

১৮.১.৭৫—সাক্ষাৎ মূর্তি আর দেবদূত মূর্তি হওয়ার নিমন্ত্রণ।

৩০.১.৭৫—সেকেন্ডে ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত হবার গতি।

৯.২.৭৫—আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তন কি করে?

২৯.৮.৭৫ এখন বিধিবিধানের গণ্ডি পার করে সিদ্ধিস্বরূপ হতে হবে।

১০.৯.৭৫—জ্ঞানী আর শক্তিশালী আত্মাই বিজয়ী।

১৩.৯.৭৫—বিশ্ব পরিবর্তনই ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ কর্তব্য।

১৪.৯.৭৫—অকালের সিংহাসনে বসে আর মহাকাল মূর্তি (কালজয়ী) হয়ে গুটিয়ে নেবার শক্তির প্রয়োগ করো।

২০.৯.৭৫—শক্তি থাকা সত্ত্বেও জীবনে সফলতা সন্তুষ্টতা নেই কেন?

২১.৯.৭৫—ফরিস্তা মানে যার শুধু একমাত্র বাপ ছাড়া আর কোনো রিস্তা নেই

৩০.৯.৭৫—সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা নিজের জ্ঞানের প্রকাশের দ্বারা চন্দ্রমাকে (ব্রহ্মা) ১৬ কলায় প্রকাশকারী জ্ঞানসূর্য শিব বাবা বলেন—

৮.১০.৭৫—চূড়ান্ত জ্ঞান স্বরূপ হওয়ার প্রেরণা 'বিশ্ব পরিবর্তন' রূপী অসীমের নাটকে প্রধান অথবা বিশেষ চরিত্রের অভিনেতা প্রস্তুত কারক আর অন্ধকার দূরকারী জ্ঞানসূর্য শিব বাবা বলেন—

১১.১০.৭৫—অন্তবাহক রূপের দ্বারা পরিভ্রমণ।

১২.১০.৭৫—অভিযোগ সমাপ্ত করে সম্পূর্ণ হওয়ার প্রেরণা।

১৬.১০.৭৫—সঙ্কল্প শক্তিকে করায়ত্ত্ব করে সিদ্ধিস্বরূপ হওয়ার যুক্তি।

১৯.১০.৭৫—মায়ার সাথে যুদ্ধকারী সৈনিকই নিজের পতাকা উত্তোলন করতে পারবে।

২০.১০.৭৫—ত্যাগের মূর্তি আর তপস্বী মূর্তি সেবাধারীই যথার্থ শিক্ষক।

২১.১০.৭৫—অসীমের বৈরাগবৃত্তিই বিশ্ব পরিবর্তনের আধার।

২৩.১০.৭৫—অপেক্ষা ছাড়ো ব্যবস্থা ধরো। বিশ্বের ভাগ্যকে উন্নতকারী মায়াবী সৃষ্টির মহাবিনাশ করে দৈব সৃষ্টির স্থাপনাকারী রচয়িতা শিববাবা, নব নির্মাণের ব্যবস্থা করার জন্য একজোট হয়ে যাবার আহ্বান করে বলছেন,—

২৪.১০.৭৫—শক্তির বিশেষ গুণ নির্ভয়তা, শিব-শক্তি সেনার সর্বোচ্চ অধিপতি (অসীমের পিতা/বেহদ

কা বাপ) সর্বশক্তিমান শিববাবা পাঞ্জাব এবং গুজরাট এরিয়ার শিবশক্তিকে সম্বোধন করে এই মধুর বাক্য উচ্চারণ করলেন,—

(৬৯ এর বাণী পেজ নং ৩০) 'ভারতমাতা শক্তি অবতার' অন্তের সময়ে এটাই থাকবে স্লোগান। যেমন বাপ তেমন সন্তান এটাই চিত্রায়িত হবে।

১৮.৫.৬৯—(পেজ নং ৭৩) শেষের জিগিরেও ভারতমাতা শক্তি অবতারেরই উদ্গাতা। গোপী মাতা কি আর করবেন!?

২১.৩.৮৩—ভারতমাতা শক্তি অবতার না হলে ভারতের উদ্ধার সম্ভব নয়।

১.৬.৮৩—(পেজ নং ১৯৩) কোন কথাটা এখন বাকি থেকে গেল? নতুন দুনিয়ার জন্য ধরনী বানাচ্ছ কিন্তু নতুন দুনিয়ার আধার এই নতুন জ্ঞান। প্রথম প্রাধান্য তো জ্ঞানেরই তাই না? বাপের গরিমাতে প্রথমে কোন্ গুণ আসে? 'জ্ঞানসাগর' বলা হয় না? তো প্রথম মহিমা হ'ল জ্ঞান। ওই নতুন জ্ঞানকে দুনিয়ার কাছে প্রকাশ করেছেন? যতক্ষণ না এই নতুন জ্ঞান প্রত্যক্ষ হচ্ছে জ্ঞান দাতা কি করে প্রত্যক্ষ হন? প্রথমে জ্ঞান আসে তারপর আসেন জ্ঞানদাতা। তো জ্ঞানদাতা উচ্চাতিউচ্চ। উনিই জ্ঞানদাতা সেটা কিভাবে প্রমাণ হবে? এই নতুন জ্ঞানের মাধ্যমেই প্রমাণ হবে। আত্মা কি বলে আর পরমাত্মা কি বলেন এই পার্থক্য যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের বুদ্ধিতে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত যা কিছু খড়কুটো আঁকড়ে আছে সেটা ছাড়বে কি করে? আর 'একমেবদ্বিতীয়মের' সাহায্য কি করে নেবে? এখন তো ছোটো ছোটো খড়কুটোর সাহায্যেই চলছে, সেটাকেই নিজের আধার ভাবছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানদাতার ছত্রছায়া অনুভব না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই সীমার বাধন থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

এতদিন পর্যন্ত ধরনী বানানোর, বায়ুমণ্ডল পরিবর্তনের সেবা করা হয়েছে ভাল কার্য। পরিবারের ভালবাসা আছে। এই ভালোবাসার গুণ বায়ুমণ্ডল পরিবর্তন করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। ধরনীতো তৈরি হয়ে গেছে। আর তৈরি হয়েই চলবে, কিন্তু যে ভিত, নবীনতা, বীজ সেটা হল 'নতুন জ্ঞান'। নিঃস্বার্থ ভালবাসা, আত্মিক ভালবাসা এ সকলতো অনুভূত হয়, কিন্তু এখন ভালবাসার সাথে সাথে 'জ্ঞানের অধিকারী' আত্মারাও আছেন। সত্যজ্ঞানের আধিকারীক আছেন, প্রত্যক্ষ হবার এখনো বাকি আছে। যারাই আসেন বোঝেন যে এটা নতুন জ্ঞান, নতুন কথা এটা। যেটা কেউ শোনায়নি সেটা এখানে শোনা যাচ্ছে। যাতে বোঝা যায় এটার বর্ণনাকারী একমাত্র 'অলমাইটি অথরিটি'। পবিত্রতা, শান্তি, ভালবাসা স্বচ্ছতা এসব তো ভিত, যে ভিতের উপর ধরনী পরিবর্তন শুরু হয়েছে, এটাও চারটি স্তম্ভ। প্রথমে তো কারো বুদ্ধি এভাবে টিকত না। কিন্তু এখন এই চার স্তম্ভের আধারের দ্বারা বুদ্ধি আকর্ষিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনটাতো হয়েছে কিন্তু এখন প্রধান কথা হ'ল এটাই যে—নতুন জ্ঞান পাকাপোক্ত হোক। কারণ ধর্মযুদ্ধওতো এখনো বাকি আছে না? এখনো পর্যন্ত তো গুরুদের গদিও নাড়ানো হয়নি, এখোনোতো শাখা/প্রশাখা সমূহ খুব আরামে সবাই নিজেদের নিয়ে মত্ত হয়ে আছে। বীজ কখন প্রত্যক্ষ রূপ ধারণ করে? জানো কি বীজ কখন সামনে আসে? যখন ছোট-বড় সকল ডালপালা

শুকিয়ে পাতা ঝরে যায়, তখন বীজ প্রত্যক্ষ হয়। তো তার বিমান বানানো হয়েছে। কেউ যখন নিজের মঞ্চে আসেন তখন তার নিজের আসল জ্ঞানতো থাকা চাই, তাই নয় কি? যদি আশীর্বাদের ভূমিতে এসেও শুধু বলে যে, শান্তি খুব ভালো, ভালোবাসা খুব ভালো; শুধুমাত্র এই সামান্য কিছু ঝুলিতে করে নিয়ে গেলে, এই অসামান্য ভূমিতে এসে বিশেষ লাভ কি হল? নতুন জ্ঞানও তো লাভ করা চাই তাই না? এই নতুন জ্ঞানের দ্বারাই তো অলমাইটি অথরিটিকে সিদ্ধ করা যাবে। দেবে কে? প্রেম আর শান্তি পাওয়ার পর এটা তো অবশ্যই বোঝা যায় যে এসব যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কোনো শ্রেষ্ঠ কেউ তাই না? কিন্তু তিনি যে 'স্বয়ং ভগবান' সেটা খুব বিরল ব্যক্তিরাই বোঝেন। তো বোঝা গেল কি বাকি আছে? এখন নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন জ্ঞান চারিদিকে প্রসার করো বুঝলে? কোটির মধ্যে হয় কেউ হবে কিন্তু এমন জিগির হোক যে চারিদিকে সাড়া পড়ে যায় এই ব্রহ্মা কুমারী দুনিয়াকে নতুন জ্ঞান দেয়। তার আধার কি? তাকে সিদ্ধ কিভাবে করা যাবে। এটা যখন খবরের কাগজে বের হবে তখন ভাববে যে জ্ঞান দাতার জয়ধ্বনী হল। বুঝলে? জ্ঞানের প্রভাবে প্রভাবিত হও। জ্ঞানের প্রভাবশালী আর প্রেমের প্রভাবশালীর মধ্যে তফাৎ কি? ব্রাহ্মণদের মধ্যেও দুটি ভাগ দেখা যায়।

ব্রাহ্মণ তো তৈরি হয়েছে, কিন্তু কেউ প্রেমের আধারে আর কেউ জ্ঞান আর প্রেম দুটোরই আধারে। তো দুজনের মধ্যে স্থিতির পার্থক্য আছে না? যে ভালবাসাকেও জ্ঞান দিয়ে বোঝে সে নির্বিঘ্ন চলবে। যে শুধু প্রেমের আধারে চলে সে শক্তিশালী আত্মা তৈরি হবে না। জ্ঞানের বল অবশ্যই চাই। যাদের পড়ার প্রতি ভালবাসা আছে, মুরলীর প্রতি প্রেম আছে, আর যাদের শুধু পরিবারের প্রতি ভালোবাসা আছে তাদের মধ্যে কতো তফাৎ! ব্রাহ্মণ জীবন ভাললাগে, পবিত্রতা ভালোলাগে, এই আধারেতে আগতরা আর জ্ঞানের শক্তির দ্বারা আগতদের মধ্যে কতই তফাৎ! জ্ঞানের মত্ততা, অলৌকিক, নিরাকার থাকার আনন্দ। তবে দেখা যায় তো প্রেমও একটা শক্তি। কিন্তু প্রেমশক্তিতে বলিয়ানেরা বিনা আধারের সহযোগীতা নিয়ে চলতে পারে না। কোন না কোন আধার তার অবশ্যই চাই। মনন শক্তি তাদেরই আছে যারা জ্ঞানের শক্তিতে বলবান। যত মননশক্তি হবে ততই বুদ্ধির একাগ্রতা শক্তি অটোমেটিকালি আসবে। আর যেখানে বুদ্ধির একাগ্রতা আছে সেখানে পরখ করার ও নির্ণয় নেওয়ার শক্তি স্বতঃতই আসে। যেখানে জ্ঞানের ভিত থাকে না, সেখানে পরখ করার শক্তি আর নির্ণায়ক শক্তি কমজোরি হয়। কেননা একাগ্রতা সেখানে থাকে না। ঠিক আছে?

৪.১.৭১—(সঞ্জীবনী, পেজ নং ৩৬) গুজরাটের রাজধানী আমেদাবাদকে সারা বিশ্বের লাইট হাউজ বানাতে হবে। (খণ্ড-১, পেজ নং ২৪) আমেদাবাদ পাণ্ডবভবন তৈরি হলে বিশ্ববিজেতা ১০৮ জন মালার পুথি, সম্পর্ক তৈরি করার জন্য এখানেই আসবেন, কেননা গুজরাটের রাজধানী আমেদাবাদকে সারা বিশ্বের নাইট হাউস বানানো হবে। সঞ্জীবনী পেজ নং ৩৬-এ আরো আছে—গুজরাটকে এমন লাইটহাউজ বানাও যেটা শুধুমাত্র গুজরাটের নয় সারা বিশ্বের লাইট হাউস যেন হয়। এমন পারমাত্মিক বোমা ফাটাও যেন চমৎকার

হয়ে যায়। যেন আত্মারা দৌড়ে এসে আপন শিবিরে প্রবেশ করে। যাদের বিন্দুরূপি স্টেজ-এর স্থির অভ্যাস হয়ে যাবে তারা অন্তিম সময়ে ডায়রেক্ট বাপের থেকে শিখতে পারবে।

২২.১.৭০—'জ্ঞানসূর্যের উদয় হলে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে' অর্থাৎ মুরলীর প্রতিটি গুহে রহস্য মুখ্য মুখ্য অভিনেতাদের সাথেই খুলে যাবে। সঞ্জীবনী পেজ নং ১৮তে আছে, অন্তিম শক্তিশালী বোমা হ'ল পরমাত্মার প্রত্যক্ষতা। যেটা এখনো শুরু করা হয়নি। শিক্ষক হলেন স্বয়ং অলমাইটি অথরিটি। জ্ঞান সূর্য সাকার সৃষ্টিতে উদয় হয়েছেন। এই ব্যাপরটা এখনো গুপ্ত আছে কেননা উল্টোদিকে জ্ঞানচন্দ্রমা এখনো অস্ত যায়নি। এই শেষ অস্ত্রটির সাহায্যে প্রত্যেক ব্রাহ্মণের মধ্যে বাপকে দেখা যাবে। এই বিশ্বে 'বিশ্বপিতা' স্পষ্ট দেখা দেবেন।

১৫.১২.২০০৭—যে কোন সেবা করছ খুবই ভালো কিন্তু এখন কি বিশ্বপরিবর্তনের কার্যে সহযোগিতা করছ? এই সঙ্কল্প নিয়েছো কি, যে বিশ্বপরিবর্তনের জন্য সকল সময় সহযোগী থাকবে? কেননা তোমরা পরমাত্মার সেবা সহজেই করতে পারো। কি করে করবে?

১৫.১২.২০০৭—এটা direct ঈশ্বরের কার্যে সহযোগী হওয়া বিরাট পুণ্যের। এই পুণ্যের পুঁজিই সঙ্গে যাবে আর কিছু নয়।

৫.৩.২০০৮—আজকের দিনে তো এখানে এই পতাকা উড়ছে কিন্তু এখনো সেই দিন আসাও বাকি আছে যখন সারা বিশ্বের জায়গায় জায়গায় এই পতাকা উত্তলোনের অনুষ্ঠান হবে। আর সকল আত্মার মুক্তিদাতা, বরদাতা বাবা এসে গেছেন। 'সারা পৃথিবীর সবার মনে অটোমেটিক এই গান চালু হয়ে যাবে। তোমাদের মনে তো এই গানটা শুরু হয়ে গেছে না? এসে গেছেন, পেয়ে গেছি, বরদান পেয়ে গেছি, প্রার্থনার ফল পেয়ে গেছি। তো এই পতাকা যেমন তোমার মনে দুলছে ঠিক তেমন বিশ্বের সব আত্মার মনে দোলাতে হবে। বহু বছরের প্রাপ্তি হবে না কিন্তু 'হে প্রভু আপনি এসে গেছেন' এই গানটাতো গাইতেই হবে।

১৮.১.৯৬—(পেজ নং ১০৮) যে বাচ্চারা সাকারের পরে এসেছে তারা ভাবে যে ব্রহ্মা বাবা নিজের সাকার অংশ এত তাড়াতাড়ি কেন শেষ করলেন! আমরা তো দেখতাম, আমরা তো মিলতাম না? ভাবো না? কিন্তু কল্পেরও আগের গানটা হল কৌরব সেনার জন্য তৈরি হওয়া মহাবীরের কল্যাণ কার দ্বারা হয়েছে? শক্তির দ্বারা হয়েছে না? তো শক্তির অংশ নাটকে সাকার রূপের মধ্যে নিহিত আছে। আর সবাই এটাই মানে যে মাতৃশক্তির সাহায্য ছাড়া এই বিশ্বের কল্যাণ হওয়া অসম্ভব।

পরম শান্তি